বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৫-২০১৬

পরিবেশ অধিদপ্তর

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমের ইতিহাসে ২০১৫ সালটি একটি মাইলফলক। জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ রক্ষায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এ বছর জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-কে লীডারশীপ ক্যাটাগরীতে সর্বোচ্চ পুরস্কার "চ্যাম্পিয়ন অব দ্যা আর্থ, ২০১৫" প্রদান করে।

চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ অর্জন করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী-কে পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রাণঢালা অভিনন্দন

ভূমিকা

আদিকালে মানুষ যখন প্রকৃতির মাঝে বাস করতো তখন প্রকৃতি চলতো তার নিজস্ব গতিতে। ফলে প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্যে ছিল ভারসাম্যের বন্ধন। সময়ের বিবর্তনে মানুষ তার অনুসন্ধিৎসু মস্তিষ্কের ব্যবহার করে বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করে। ফলে নগরায়ণ, শিল্পায়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ইতিবাচক প্রভাব দেখা দেয়। আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে শিল্পবিপ্লব শুরু হলে আবিষ্কার হতে থাকে নতুন নতুন কলকারখানা, ফলে মানুষের জীবনযাত্রাও দিন দিন সহজতর হতে থাকে। সভ্যতার ক্রমবিকাশে শিল্প বিপ্লবের ফলে একদিকে মানুষের জীবন-যাত্রার মান যেমন বেড়েছে, ঠিক তেমনি শিল্পায়ন ও অপরিনামদর্শী কর্মকান্ডের দরুন পৃথিবীর নির্মল পরিবেশে বিষাক্ত পদার্থের অনুপ্রবেশ ঘটে পৃথিবীর পরিবেশ ও প্রতিবেশের উপর মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি করছে। পরিবেশ দূষণের বিষয়টি বিভিন্ন গবেষক ও বিজ্ঞানীগণ নিজ নিজ গবেষণা ও লিখনির মাধ্যমে তুলে ধরলেও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ শুরু হয় ১৯৭২ সাল হতে। জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৭২ সালে সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত হয় United Nations Conference on the Human Environment। সম্মেলনে শিল্পায়নের কারণে যে পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে তা নিরসনের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ সম্মেলনের সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রমের যাত্রা শুরু এবং United Nations Environment Program (UNEP) এর সৃষ্টি।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই পরিবেশ এবং প্রকৃতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে। পরিবেশের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯৭৩ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান Water Pollution Control Ordinance ১৯৭৩ জারি করেন। ১৯৭৩ সালেই পানি দূষন নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমের সূচনা হয়। পরবর্তীকালে সরকার ১৯৭৭ সালে পরিবেশ দূষণ অধ্যাদেশ জারি করে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সেল গঠন করে। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সেলের কার্যক্রম মনিটর করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের একজন সদস্যের নেতৃত্বে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠন করা হয়। সরকার ১৯৮৯ সালে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় নামে পৃথক একটি মন্ত্রণালয় গঠন করে এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নাম পরিবর্তন করে পরিবেশ অধিদপ্তর নামে একটি অধিদপ্তর পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যাস্ত করা হয়। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো বিভাগীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল এবং জনবল ছিল মাত্র ১৭৩ জন। পরবর্তীকালে সরকার ২০১০ সালে পরিবেশ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠোমো ২১টি জেলায় সম্প্রসারণ করে এবং জনবল ৭৩৫ জনে উন্নীত করে।

দেশের প্রকৃতি ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ করে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রধান কাজ। মূলত পরিবেশ অধিদপ্তর একটি পরিবেশ সংক্রান্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা। কাজের ধরন অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে কয়েকটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়। এ-গুলো হল: দূষণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর বাস্তবায়ন; জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ; জীবনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; ও পরিবেশ সুরক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।

বর্তমান পরিবেশ বান্ধব সরকার সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর মাধ্যমে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নকে সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে সংবিধানে ১৮ক অনুচ্ছেদ সংযোজন করেছে। উক্ত অনুচ্ছেদ মোতাবেক রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করবে এবং জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর নিরাপত্তা বিধান করবে। শুধু তাই নয় সরকার তার চলতি মেয়াদের নির্বাচনী ইশতেহারে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছে। নির্বাচনী ইশতেহারে সরকার বায়ুদূষণ, পানিদূষণ, শব্দদূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় কার্যকরী ভুমিকা রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ রক্ষায় সরকারের লক্ষ্য বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ করছে। দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশগত মানোন্নয়নে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কার্যসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কার্যসমূহের বর্ণনা বার্ষিক প্রতিবেদনে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

ভিশনঃ

২০২১ সালের মধ্যে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত বাসযোগ্য একটি সুস্থ, সুন্দর, টেকসই ও পরিবেশসম্মত বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

মিশনঃবর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ্য, সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে-

- বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলা।
- পরিবেশ সংক্রান্ত আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের যথাযথ প্রয়োগ।
- পরিবেশ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি।
- টেকসই উন্নয়ন ও পরিবেশ সুশাসন নিশ্চিত করা।
- উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা
- "গ্রিণ গ্রোথকে" উৎসাহিত করা।

পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যাবলীঃ

১. শিল্প প্রতিষ্ঠানের দূষণ জরিপ, দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণসহ দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে উদ্বুদ্ধ/বাধ্য করা এবং প্রয়োজন অনুসারে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন এবং বিধি লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা ও পরিবেশ আদালতে মামলা দায়েরের মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;

২. পরিবেশ দূষণকারীদের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ ধার্যপূর্বক আদায় করা ;

৩. নতুন স্থাপিতব্য বা বিদ্যমান শিল্পকারখানার/প্রকল্পের আবেদনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সন্তোষজনক পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হয়ে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান;

৪. সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তি পর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন এবং ইআইএ সম্পন্ন করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;

৫. পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ এবং তা তদন্তের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা, নির্বিচারে পাহাড় কর্তন রোধ, যানবাহন জরিপ এবং দূষণকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;

৬. বায়ু ও পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ, গবেষণাগারে বায়ু, পানি ও তরল বর্জ্যের নমুনা বিশ্লেষণ;

৭. দেশের বিভিন্ন এলাকার পুকুর, টিউবওয়েল ও খাবার পানির গুণগতমান নির্ণয়ের জন্য নিয়মিত নমুনা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, ডাটা সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রেরণ;

৮. পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন, চুক্তি ও প্রোটোকলের দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৯. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

১০. ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রী নিয়ন্ত্রণ; ওজনস্তর সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক সহায়তায় স্থানীয়ভাবে কার্যক্রম গ্রহণ, গণসচেতনতা ও অংশীজনের সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

১১. পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দিবস পালন ;

১২. পরিবেশ সংক্রান্ত গ্রীন/ক্লিন টেকনোলজি উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগপূর্বক টেকনোলজি প্রচলনের জন্য পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে

১৩. টেকনোলজি ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;

১৪. দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জীবনিরাপত্তার ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ;

১৫. বিষাক্ত এবং বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের আমদানি, পরিবহন, ব্যবহার, ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রম গ্রহণ;

১৬. প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় জনগণের অংশগ্রহণে টেকসই জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

১৭. পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং পরিবেশ বিষয়ক তথ্য সকলের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা এবং পরিবেশ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপন;

১৮. দেশের পরিবেশগত অবস্থানচিত্র প্রণয়ন (State of Environment Report) ও বিতরণ;

১৯. পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক/ সাংস্কৃতিক/ অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর সাথে অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা;

২০. পরিবেশগত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকল্প এবং গবেষণাকর্ম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

২১. নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ উৎপাদন ও বাজারজাতকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;

২২. সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প/উদ্যোগ পর্যালোচনা ও মূল্যায়নপূর্বক পরিবেশগত মতামত প্রদান;

২৩. পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সক্ষমতা তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, মতবিনিময় সভা, ইত্যাদি আয়োজন;

২৪. দেশের প্রায় সকল মন্ত্রণালয় এবং তার অধীনস্থ দপ্তরসমূহসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন কমিটির সদস্য হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন;

২৫. শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবলঃ

বর্তমানে পরিবেশ অধিদপ্তরে অনুমোদিত জনবলের মোট সংখ্যা **৭২০** জন। এর মধ্যে নিয়োগকৃত জনবল ৪৩১ জন। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে পরিবেশ অধিদপ্তরে ১০ম গ্রেডের পদে ৬ জন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রাপ্ত হন। এর মধ্যে পরিদর্শক পদে ৫ জন ও সহকারী বায়োকেমিস্ট পদে ১ জন কর্মকর্তা যোগদান করেন। উক্ত সময়ে ১০ম গ্রেডের ৩ জন কর্মকর্তা ৯ম গ্রেডে এবং ১৫তম গ্রেডের ৬ জন কর্মচারী ১০ম গ্রেডে পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়েছেন।

ছক-১: পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক	শ্রেণী	অনুমোদিত পদ	কর্মরত জনবল	শূন্যপদের বিবরণী	২০১২ - ২০১৩ সময়ে নিয়োগকৃত জনবল	২০১৩-২০১৪ সময়ে নিয়োগকৃত জনবল	২০১৪-২০১৫ সময়ে নিয়োগকৃত জনবল	২০১৫-২০১৬ সময়ে নিয়োগকৃত জনবল	মন্তব্য
১।	১ম শ্রেণী	২০৫	১১৪	৯১	২৫	১২	৬	-	
২।	২য় শ্রেণী	১২৫	৫৩	৭২	৩৭	০৭	৮	৬	
৩।	৩য় শ্রেণী	২৬৮	১৫৯	১০৯	৫০	-	৪	-	
৪।	৪র্থ শ্রেণী(আউটসোর্সিংসহ)	১২২	১০৫	১৭	০১	১	-	-	
৫।	মোট	৭২০	৪৩১	২৮৯	১১৩	২০	১৮	৬	

পরিবেশ অধিদপ্তরের সাংগাঠনিক কাঠামো

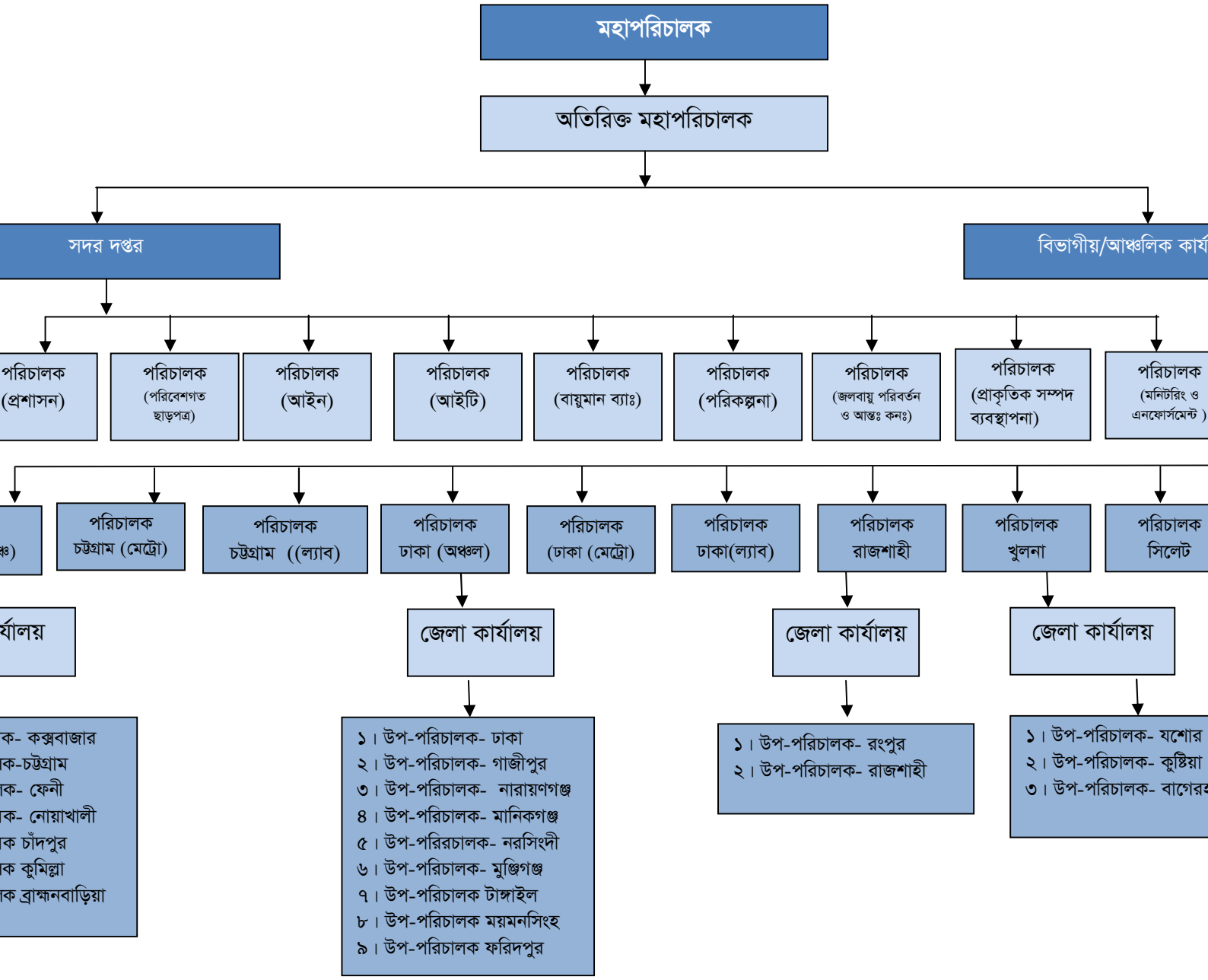

বায়ুমান ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

ক্রমবর্ধমান নগরায়নের ফলে অবকাঠামো নির্মান, যানবাহন ও কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এ সকল উৎস থেকে সৃষ্ট বায়ুদূষণও বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে ক্রমাগত ভাবে। দীর্ঘমেয়াদী বায়ুর গুণগতমান পরিবীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে, বর্ষা মৌসুমে বাতাসে গ্যাসীয় পদার্থ ও বস্তুকণা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় থাকলেও, শুস্ক মৌসুমে (নভেম্বর - মার্চ মাসে) রাজধানী ঢাকাসহ দেশের প্রধান প্রধান শহরগুলোতে বস্তুকণা গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে বেশি থাকে। ক্ষতিকর রাসায়নিক গ্যাস ও সূক্ষ্ম বস্তুকণা শ্বাসের সংগে গ্রহনের ফলে স্বল্পমেয়াদে শ্বাসকষ্ট, শ্বাসযন্ত্রে প্রদাহ, চোখ জ্বলা ও ফুসফুসের রোগসহ বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী বায়ুদূষণের প্রভাবে দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসযন্ত্রের রোগ, ফুসফুসের ক্যান্সার, হৃদরোগ এবং এমনকি স্নায়ুতন্ত্র, কিডনি, লিভার ও মস্তিকের ক্ষতি হতে পারে। এসব রোগ অনেক সময় মানুষের অকাল মৃত্যুরও কারণ হয়ে থাকে। বায়ুদূষণের কারণে উদ্ভিদকোষের বিপাক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হয়। ফলে উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। কৃষি উৎপাদন কমে যায়। ফলশ্রুতিতে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মানবস্বাস্থ্যের উপর বায়ুদূষণের বিরূপ প্রভাবসহ অন্যান্য ক্ষতিকর প্রভাব নিরসনের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে উন্নত প্রযুক্তির ইটভাটার প্রচলন, যানবাহন ও কলকারখানা সৃষ্ট ক্ষতিকর ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ, অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম থেকে দূষণ নিয়ন্ত্রণসহ নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহন করেছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান কাজ হলো বায়ুদূষণের এ সকল উৎসসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক তা নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ। পরিবেশ অধিদপ্তর দেশে ১১টি স্থায়ী ও ৫টি মোবাইল মনিটরিং স্টেশনের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত দেশের পারিপার্শ্বিক বায়ুর গুণগত মান পরিবীক্ষণ করে থাকে। বায়ুর গুণগতমান ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রমের বিবরণ এখানে পেশ করা হলো:

ইট ভাটা সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ বাস্তবায়ন

আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের সাথে সাথে নির্মাণশিল্পের ব্যাপকতার কারণে দেশে ইটের চাহিদাও বেড়েছে বহুগুণে। ফলে যততত্র গড়ে উঠেছে হাজার হাজার ইটভাটা। ইটভাটাসৃষ্ট ব্যাপক বায়ুদূষণ পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে দাড়িয়েছে। এছাড়া ইটের কাঁচামাল হিসেবে কৃষি জমির উপরিভাগের মাটি (Top soil) ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ইটভাটাসৃষ্ট এই জটিল সমস্যা কার্যকরভাবে মোকাবেলার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে "ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩" এর খসড়া প্রণয়ন থেকে শুরু করে জাতীয় সংসদে অনুমোদন ও জারী করার প্রক্রিয়ায় পরিবেশ অধিদপ্তর মূল ভূমিকা পালন করেছে। এই আইনে, যা গত ০১ জুলাই ২০১৪ হতে কার্যকর হয়েছে, ইট পোড়ানোর কাজে জ্বালানী কাঠের ব্যবহার এবং ইট প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে কৃষি জমি বা পাহাড় বা টিলা হতে মাটি কেটে ইটের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই আইনে কতিপয় স্থানে ইটভাটা স্থাপন নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং এই আইন কার্যকর হবার পর নিষিদ্ধ এলাকার সীমানার অভ্যন্তরে ইটভাটা স্থাপনের জন্য কোনরূপ অনুমতি বা ছাড়পত্র বা লাইসেন্স প্রদান করা যাবে না। এছাড়া মাটির ব্যবহার হ্রাস ও বায়ুদূষণ কমানোর লক্ষ্যে কংক্রিট ব্লক ইট, ফাঁপা ইটসহ আধুনিক প্রযুক্তির ইট প্রস্তুতকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

সনাতন পদ্ধতির ইটভাটাসমূহকে আধুনিক প্রযুক্তিতে রূপান্তর

গবেষণায় দেখা গেছে সনাতন পদ্ধতির ইটভাটাসমূহকে জ্বালানী সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব ইটভাটায় রূপান্তর করা গেলে জ্বালানীর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাসসহ ৭০-৮০% দূষণ কমানো সম্ভব হবে। এ প্রেক্ষিতে পরিবেশ অধিদপ্তর দেশে বিদ্যমান সনাতন পদ্ধতির ১২০ফুট চিমনীবিশিষ্ট ইটভাটাসমূহকে জ্বালানী সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব উন্নত প্রযুক্তিতে রূপান্তরের জন্য কাজ করে যাচ্ছে এবং সনাতন পদ্ধতির নতুন ইটভাটার অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান বন্ধ করা হয়েছে। প্রচলিত সনাতন প্রযুক্তির ইটভাটাসমূহকে পরিবেশসম্মত এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী উন্নত প্রযুক্তির হাইব্রিড হফম্যান কিল্ন্ (Hybrid Hoffman Kiln), জিগজ্যাগ কিল্ন (Zigzag Kiln), ভার্টিক্যাল স্যাফ্ট ব্রিক কিল্ন্ (Vertical Shaft Brick Kiln), টানেল কিল্ন্ (Tunnel Kiln) বা পরীক্ষিত অন্য কোন

চিত্র: টানেল প্রযুক্তির ইটভাটা

উন্নত প্রযুক্তিতে রূপান্তর করে ইট পোড়ানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫-এর আলোকে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিভিন্ন সময় গণবিজ্ঞপ্তি জারী করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতিতে ইটভাটা নির্মাণে উদ্যোক্তাগণকে উৎসাহিতকরণ

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতিতে ইটভাটা নির্মাণে উদ্যোক্তাগণকে অধিকতর সচেতন করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩" মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে ইটভাটা মালিক সমিতি, সাংবাদিক, এনজিও কর্মী, সুশীল সমাজ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে নতুন প্রযুক্তির বিষয়ে ইটভাটার মালিকদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ইটভাটার মালিকদের নিয়ে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে । এছাড়া বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে সকল জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ইটভাটা মালিক সমিতিসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের উপস্থিতিতে আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

চিত্র: গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৫ পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ রইছউল আলম মন্ডল-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠেয় বায়ু দূষণ বিষয়ক মতবিনিময় সভা।

পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতিতে ইটভাটা নির্মাণে উদ্যোক্তাগণকে প্রণোদনা প্রদান

পরিবেশ অধিদপ্তরের উদ্যোগে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন 'কেস প্রকল্প'-এর সহায়তায় দেশের ৭টি বিভাগে পরিবেশ বান্ধব আধুনিক প্রযুক্তির প্রদর্শনী ইটভাটা নির্মাণ করা হয়। প্রদর্শনী ইটভাটা নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাগণকে 'কেস প্রকল্প' হতে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়।

চিত্র: পরিবেশ বান্ধব প্রদর্শনী ইটভাটার মালিকদের প্রণোধনামূলক চেক প্রদান করছেন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

দূষণকারী ইটভাটার বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ

ইটভাটা সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে অবৈধ ইটভাটা পরিচালনাকারীদের বিরুদ্ধে ১৪৭টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে ২.৪৬ কোটি টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং ২টি ইটভাটার বিরুদ্ধে পরিবেশের ক্ষতির জন্য ৪.৬৮ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছে।

আধুনিক প্রযুক্তির ইটভাটায় রূপান্তর

পরিবেশ অধিদপ্তরের বহুমূখী উদ্যোগের ফলে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে দেশের মোট ৪১৬১টি ইটভাটা আধুনিক প্রযুক্তিতে রূপান্তর করা হয়েছে, যা মোট ইটভাটার প্রায় ৬২.৩৯% ভাগ।

ছক: বিভাগভিত্তিক ইটভাটার হালনাগাদ তথ্যাদি

ইটভাটার হালনাগাদ তথ্যাদি (জুন ২০১৬ পর্যন্ত)								
ক্রমিক	বিভাগের নাম	ইটভাটার সংখ্যা	ফিক্সড চিমনী (৮০-১২০ফুট)	জিগজ্যাগ/ উন্নত জিগজ্যাগ	হাইব্রিড হফম্যান	অটোমেটিক /ট্যানেল কিলন	উন্নত অন্যান্য প্রযুক্তি	উন্নত প্রযুক্তিতে রূপান্তরের সংখ্যা
১.	বরিশাল	৩০৯	১২০	১৮৭	২	০	০	১৮৯
২.	চট্টগ্রাম	১৪৫৫	৫১৯	৮৭২	২০	২	০	৮৯৪
৩.	সিলেট	২১১	৫৮	১৬২	১	০	০	১৬৩
৪.	ঢাকা	২৩৪৭	৯৬০	১৪৮৪	২৯	৩০	২	১৫৪৫
৫.	খুলনা	৭৯৬	২৯৪	৪৯০	২	৯	০	৫০১
৬.	রাজশাহী	১৫১৯	৬৫১	৮৫০	১৯	০	০	৮৬৯
	মোট =	৬৬৩৭	২৫৯২	৪০৪৫	৭৩	৪১	২	৪১৬১

গণসচেতনতা সৃষ্টি

বায়ুদূষণ বিষয়ে জনগণকে অধিকতর সচেতন করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সম্প্রতি পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে দেশের বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে একটি সভা ২৪/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। ''ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩''এর আলোকে সর্বমোট ক) পোস্টার ৭৫,০০০ (পঁচাত্তর হাজার) টি, খ) লিফলেট ১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টি, গ) গেজেট ৩,০০০ (তিন হাজার) টি এবং ঘ) গণবিজ্ঞপ্তি ২০,০০০ (বিশ হাজার) টি অধিদপ্তরের সকল বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে সকল জেলা প্রশাসক, উপজেলা কার্যালয় এবং সকল ইটভাটা মালিক সমিতির নিকট এবং জনসাধারনের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া সারা দেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পোস্টার লাগানো হয়েছে এবং বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে আইন ও এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত টিভি স্পট প্রচার করা হয়েছে।

যানবাহন হতে সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ

যানবাহন সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে ঢাকা-চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন শহরে গাড়ীর ধোঁয়া পরিবীক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করছে এবং বিধিবদ্ধ মানমাত্রার অধিক দূষণ সৃষ্টিকারী গাড়ীর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। ২০১৫-১৬ খ্রিঃ সময়ে সারা দেশে মোট ২৫ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে পেট্রোল ও ডিজেল চালিত মোট ৪৫০ টির অধিক মোটরবাইক, কার, মাইক্রোবাস, মিনিবাস, বাস, ট্রাক, মিনিট্রাক এবং অটোরিক্সার নিঃসৃত ধোঁয়া পরিবীক্ষণ, ফলাফল বিশ্লেষণপূর্বক মোট ১.৭৮ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

চিত্র-৩:পরিবেশ অধিদপ্তর পরিচালিত যানবাহন নিঃসরিত কালোধোঁয়ার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম

বায়ুমান ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পসমূহ

বায়ুমান ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাবৃদ্ধি, নীতি নির্ধারণী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, দূষণ রোধে পরিকল্পা প্রণয়নসহ বায়ুমান মনিটরিং ও দূষণ হ্রাস করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে বর্তমানে ২টি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে । ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হলো।

নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ (কেস) প্রকল্প (বিনিয়োগ প্রকল্প)

বায়ু দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় গবেষণাগারসমূহ কর্তৃক শিল্প প্রতিষ্ঠানের বায়ুর গুণগত মান পরিমাপের পাশাপাশি ঢাকা শহরের বায়ু দূষণ রোধের জন্য বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ৪৮৬.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মল বায়ু ও টেক্সই পরিবেশ (Clean Air & Sustainable Environment- CASE)-প্রকল্পটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের অধীন বায়ুমান মনিটরিং, বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ, গবেষণা এবং এতদ্সংক্রান্ত বিষয়ের অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত/ সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

বায়ুমান পরিবীক্ষণ ও মনিটরিং কার্যক্রম

প্রকল্পের আওতায় বায়ুর গুণগতমান পরিমাপ করার লক্ষ্যে ঢাকায় ০৩টি, চট্টগ্রামে ২টি, রাজশাহী ও খুলনা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট ও বরিশাল শহরে ১টি করে সারাদেশে মোট ১১টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন চালু রয়েছে। এই সকল স্টেশনের মাধ্যমে উক্ত শহরগুলোতে বায়ুদূষণের উপাদানসমূহের (বস্তুকণা, ওজোন, সালফার ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, ইত্যাদি) পরিমাণ সার্বক্ষণিকভাবে পরিমাপ করা হচ্ছে। পরীবিক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বায়ুর মানের অবস্থা নিরূপন করা সম্ভব হয়। এছাড়াও উক্ত সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রসমূহে আবহাওয়ার সংগে সম্পর্কিত উপাত্তসমূহ পরিমাপ করা হয়, যেমন: বায়ুর গতি, বায়ুর দিক, আদ্রতা, তাপমাত্রা, উর্ধ্বমুখী বায়ুর গতি ইত্যাদি। ২০১৫ সনের সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,

চিত্র-৪ : জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় অবস্থিত একটি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ ষ্টেশন

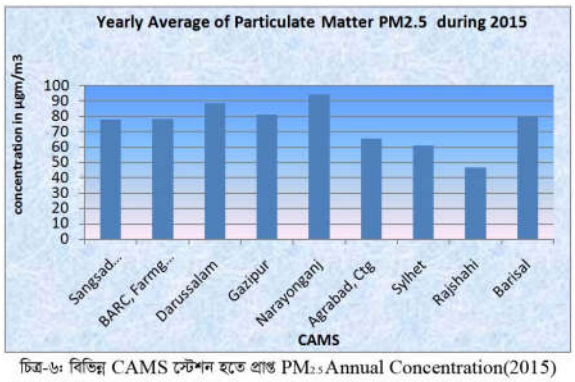

চিত্র-৬: বিভিন্ন CAMS স্টেশন হতে প্রাপ্ত $PM_{2.5}$ Annual Concentration(2015)

নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে বস্তুকণা ১০ ও বস্তুকণা ২.৫ এর মান বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় বেশী থাকে এবং প্রায়শই বায়ুর নির্ধারিত মানমাত্রা অতিক্রম করে। এই অধিক মাত্রার বায়ুদূষণের মূল কারণ হলো শুষ্ক মৌসূমে ইটের ভাটাসমূহ চালু থাকা, কম বৃষ্টিপাত এবং বাতাসের গতিবেগ কম। এই কারণে রাস্তা ঘাটেও বস্তুকণার উপস্থিতি প্রচুর পরিমানে লক্ষ্য করা যায় । কিন্তু বছরের এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে বায়ুতে বস্তুকণার পরিমাণ গ্রহণযোগ্য মাত্রার মধ্যে ছিল।

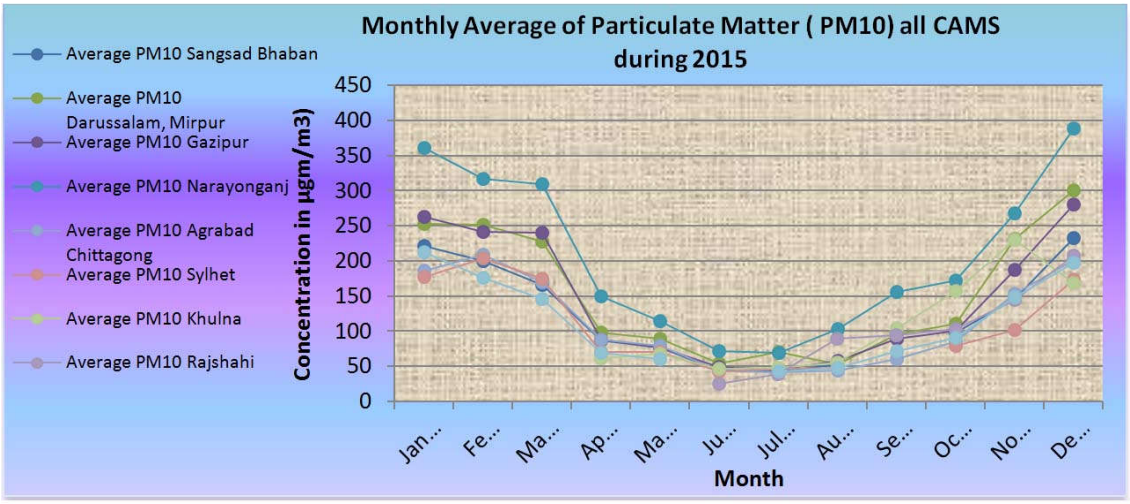

চিত্র-৭: বিভিন্ন CAMS স্টেশন হতে প্রাপ্ত PM_{10} Monthly Concentration (2015)

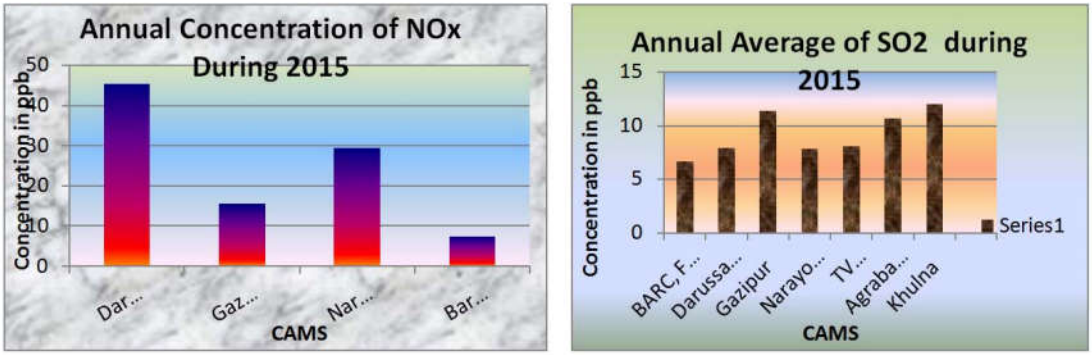

চিত্র-৮: বিভিন্ন CAMS স্টেশন হতে NO_x ও SO_2 এর Annual Concentration (2015)

পরিবেশ অধিদপ্তরের আওতায় সদর দপ্তরের তৃতীয় তলায় একটি কেন্দ্রিয় উপাত্ত নিয়ন্ত্রন (Central Data Server) কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত নিয়ন্ত্রণ কক্ষ হতে একটি কম্পিউটার Software (Envidas) এর মাধ্যমে সকল পরিবীক্ষণ কেন্দ্রের উপাত্ত সমূহে প্রবেশ করা যায়। এই কেন্দ্রিয় সার্ভার এর মাধ্যমে সকল মনিটরিং কেন্দ্রের উপাত্ত একসাথে অবলোকন করা যায় এবং যে কোন সময়ে ডাইনলোড (download) করে সংরক্ষণ করা যায়। কেন্দ্রিয় সার্ভার কক্ষটি সার্বক্ষণিকভাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন শহরে স্থাপিত বায়ুমান পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং যে কোন সময়ের প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করতে সক্ষম।

উপাত্তসমূহ পর্যালোচনা পূর্বক প্রতিদিন বায়ুমান সূচক (AQI) নিরূপনপূর্বক তা প্রকল্পের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে। পর্যবেক্ষক কেন্দ্র সমূহের প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষনপূর্বক প্রতি মাসে একটি করে মাসিক প্রতিবেদনও প্রণয়ন করা হয়, উক্ত প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে প্রকল্পের ওয়েবসাইটে (www.case-doe.gov.bd) প্রকাশ করা হচ্ছে। সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, সারা বছরের বায়ুর মানমাত্রা বস্তুকণা$_{১০}$ ও বস্তুকণা$_{২.৫}$ ব্যতীত বায়বীয় দূষক সমূহের পর্যবেক্ষণ ফলাফল সরকার নির্ধারিত মানমাত্রার মধ্যেই অবস্থান করে।

সারাদেশের ১১টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ ষ্টেশনে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে বায়ুমান সূচক কেস প্রকল্পের ওয়েবসাইটে (case_moef.gov.bd) প্রকাশ করা হচ্ছে। পরবর্তীতে পরিবেশ অধিদপ্তরের আওতায় (Air Quality Index) প্রস্তুত করে বায়ুমান সূচক নিয়মিতভাবে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের পরিকল্পনা রয়েছে। বায়ুমান সূচকের মাধ্যমে জনগণ বায়ুর সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে।

আভ্যন্তরীণ (Indoor) বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ

আভ্যন্তরীণ বায়ু দূষণ বাংলাদেশের একটি অন্যতম পরিবেশগত সমস্যা যা জনস্বাস্থ্যের উপর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। গ্রামীণ পর্যায়ে রান্নার চুলা গ্রামীণ আভ্যন্তরীণ বায়ু দূষণের অন্যতম প্রধান উৎস। প্রচলিত চূলায় জ্বালানী কাঠের যেমন বেশী প্রয়োজন হয় তেমনী রান্নার সাথে সংশ্লিষ্টদের বায়ুদূষণ জনিত নানা রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত করে। আভ্যন্তরীণ বায়ু দূষণ হতে দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে রক্ষার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর জ্বালানী সাশ্রয়ী উন্নত চুলা (বন্ধু চুলা) প্রর্বতন ও সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বন্ধু চুলা বাজার উন্নয়ন উদ্যোগ-২য় ফেজ

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট-এর অর্থায়নে এবং জার্মান সরকারের কারিগরী সহায়তায় বন্ধুচূলা প্রচলনের লক্ষ্যে 'বন্ধু চুলা বাজার উন্নয়ন উদ্যোগ'- শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। সনাতন পদ্ধতির চুলা জ্বালানী সাশ্রয়ী না হওয়ায় একদিকে যেমন বনজ সম্পদের ওপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে রান্নাঘরে Indoor Air Pollution-এর কারণে গ্রামের নারী ও শিশুরা স্বাস্থ্য ঝুকিতে পড়ছে। উপরন্তু, গ্রীন হাউজ গ্যাস বিশেষ করে কার্বন-ডাই অক্সাইডের নিঃসরণ বৃদ্ধির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি ত্বরান্বিত হচ্ছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো: বনজ সম্পদের ওপর আহরণ চাপ কমানো, বায়ুদূয়ণ হ্রাস, স্বাস্থ্য ঝুকি এবং গ্রীণ হাউজ গ্যাসের নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যে বন্ধুচুলার বাজার উন্নয়ন, পরিবেশ বান্ধব ৪ লক্ষ চুলা বিতরণ ও বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা।

এ প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হলো:

১. প্রকল্পের আওতায় জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত ২,২০,০০০ টি বন্ধুচুলা স্থাপন করা হয়েছে;
২. ৬০০ জন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা হয়েছে;
৩. জনসচেতনা বৃদ্ধির জন্য মাইকিং, লিফলেট, উঠান বৈঠক, ভিডিও প্রদর্শনী ইত্যাদি করা হচ্ছে।

দেশের নির্বাচিত এরাকায় ভারত সরকারের সহায়তায় ৭০,০০০ ইমপ্রুভড কুক স্টোভস স্থাপন

ভারত সরকার ও জিআইজেড (ইন কাইন্ড) -এর অর্থায়নে পরিচালিত সেপ্টেম্বর ২০১৫ হতে নভেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত "ইনস্টলেশন অব ৭০,০০০ ইমপ্রুভড কুক স্টোভস (আইসিএস) ইন সিলেকটেড এরিয়াস অব বাংলাদেশ" -শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মাধ্যমে মাধ্যমে ২০১৫- ২০১৬ অর্থ বছরে ৯,৬৩২টি চুলা গ্রাহকদের বাড়িতে স্থাপন করা হয়েছে, ১২২ জন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং জনসচেতনা বৃদ্ধির জন্য মাইকিং, লিফলেট, উঠান বৈঠক, ভিডিও প্রদর্শনী করা হয়েছে।

চিত্র : দেশব্যাপী পরিবেশবান্ধব ৭০ হাজার বন্ধুচুলা স্থাপনের লক্ষ্যে ভারতের সহায়তায় গৃহীত প্রকল্পের ১৪ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে শুভ উদ্বোধন করেন ভারতের ঢাকাস্থ মান্যবর হাইকমিশনার

পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

পানি প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্যতম প্রধান উপাদান এবং পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির প্রধান উপকরণ। পরিবেশকে সুস্থ ও সুন্দর রাখতে পানির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের পাশাপাশি পানি দূষণও একটি প্রধান পরিবেশগত সমস্যা হয়ে উঠেছে। এ প্রেক্ষিতে ১৯৭৩ সালে পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে বাংলাদেশে পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে পরিবেশ অধিদপ্তর পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে।

পানির গুনগত মান পরিবীক্ষণ

পরিবেশ অধিদপ্তর দেশের প্রধান প্রধান নদ-নদীসহ অন্যান্য ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির মান নিয়মিত মনিটরিং করে থাকে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নদীসহ বিভিন্ন উৎস হতে সর্বমোট ২১৩৭ টি ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর বর্তমানে ২৭টি নদীর ৬৩টি স্থানে পানির গুণগত মান নিয়মিত মনিটরিং করছে। মনিটরিং প্যারামিটারগুলি হলোঃ pH, Dissolved Oxygen (DO), Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Suspended Solid (SS), Total Dissolved Solid (TDS), Electrical Conductivity (EC), Chloride, Turbidity and Total alkalinity। ২০১৪ সালের পরিবীক্ষণের তথ্যের উপর ভিত্তি করে River Water Quality Report 2014 প্রকাশ করা হয়েছে এবং River Water Quality Report 2015 প্রকাশের কাজ চলমান রয়েছে।

চিত্রঃ পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মচারীগণ তুরাগ ও বুড়িগঙ্গা নদীর পানির গুণগতমান পরীবিক্ষণের জন্য নমুনা করছে সংগ্রহ

মনিটরিং ফলাফল হতে দেখা যায় যে, ২০১৫ সালে বাংলাদেশর বড় বড় নদী যেমন, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, করতোয়া, ধলেশ্বরী, সুরমা ইত্যাদি নদীর পানির গুণগত মান পরিবেশগত মানমাত্রার মধ্যে ছিল।

DO, BOD এবং COD এর মানের ভিত্তিতে দেখা যায় ঢাকা শহরের চারপাশের নদীগুলো শুষ্ক মৌসুমের চার/পাঁচ মাস খুব দূষিত থাকে। বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা এবং তুরাগ নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত দ্রবীভূত অক্সিজেন প্রায় শুন্য থাকে। ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বুড়িগঙ্গা নদীতে উচ্চ মাত্রার BOD ৩৫ মি:গ্রা:/লি: (পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা অনুসারে গ্রহণযোগ্য মান ৬ মি:গ্রা:/লি: বা নিম্নে), COD ১২৪ মি:গ্রা:/লি: (USEPA standard অনুসারে গ্রহণযোগ্য মান ৩৫ মি:গ্রা:/লি: বা নিম্নে). Chloride ১৩৫মি:গ্রা:/লি: (USEPA standard অনুসারে গ্রহণযোগ্য মান ২৫০ মি:গ্রা:/লি:) এবং TDS ৬৩৯ মি:গ্রা:/লি: (USEPA standard অনুসারে গ্রহণযোগ্য মান ৫০০ মি:গ্রা:/লি:) পাওয়া যায়।

১৯৭৫-১৯৭৯ এবং ২০১০-২০১৫ সালের পানির উপাত্ত বিশ্লেষণ হতে দেখা যায় যে, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষা এবং তুরাগ নদীর পানির মানমত্রা বিগত শতাব্দীর আশির দশকে পরিবেশগত মানমাত্রার মধ্যে ছিল। সময়ের সাথে সাথে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, শিল্প দূষণ, পয়:বর্জ্য ও কঠিন বর্জ্য ফেলা এবং অবৈধ দখল ইত্যাদির ফলে এ নদীগুলো প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হয়েছে।

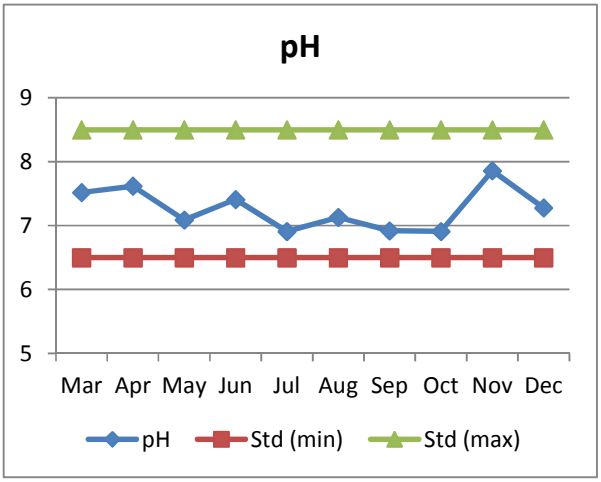

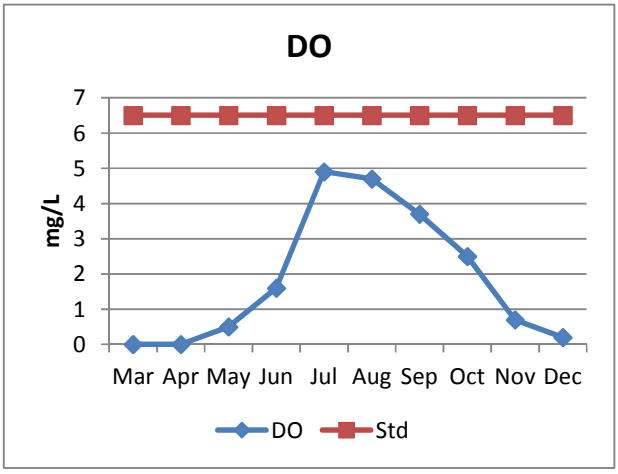

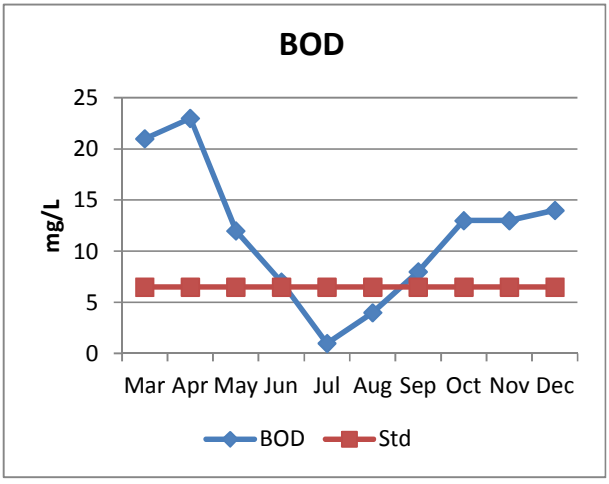

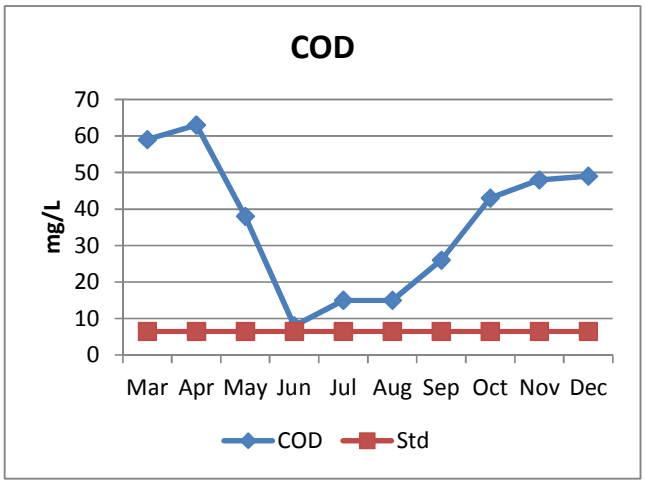

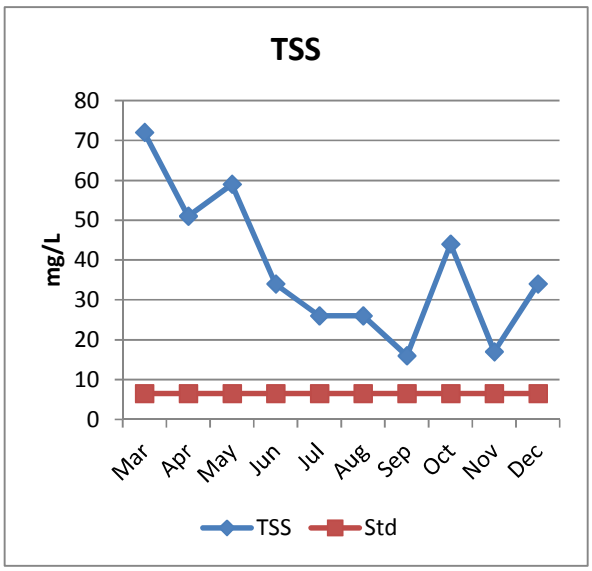

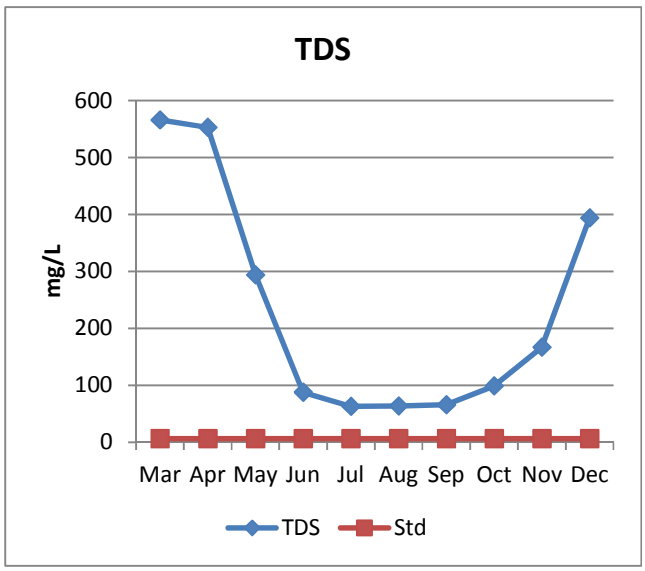

Figure: Graphical presentation of monthly mean P^H, DO, BOD, COD, TSS and TDS values

২০১৫ সালে ময়ূরী, রূপসা, পশুর ও খেকশিয়ালী নদীতে উচ্চ মাত্রায় Chloride, TDS, Turbidity পাওয়া গিয়েছে। পশুর নদীতে সর্বোচ্চ Chloride ১২৬৯২ মিঃগ্রাঃ/লিঃ (USEPA standard অনুসারে গ্রহণযোগ্য মান ২৫০ মিঃগ্রাঃ/লিঃ) এবং TDS ১৬৩৭৬ মিঃ গ্রাঃ/লিঃ (USEPA standard অনুসারে গ্রহণযোগ্য মান ৫০০ মিঃগ্রাঃ/লিঃ) পাওয়া গিয়েছে। সাধারণত দক্ষিণাঞ্চলে প্রবাহিত নদীতে বেশি Turbidity লক্ষ করা যায়। উচ্চ Turbidity-র কারণে পানির স্বচ্ছতা হ্রাস পায় ফলে পানিতে একদিকে ফাইটোপ্লাংকটনের উৎপাদন হ্রাস পায় অন্যদিকে নদীর তলদেশে পলি জমে নদী ভরাট হয়। খেকশিয়ালী নদীতে সর্বোচ্চ Turbidity 134.3Nephelometric Turbidity Unit (NTU) (গ্রহণযোগ্য মান ১০ NTU পর্যন্ত) পাওয়া গিয়েছে।

তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (Effluent Treatment Plant) স্থাপন

অপরিশোধিত তরল শিল্প বর্জ্য বাংলাদেশের পানি দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫(সংশোধিত ২০১০) ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ মোতাবেক পরিবেশ দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প কারখানায় প্রয়োজনীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ বাধ্যতামূলক। তরল বর্জ্য সৃষ্টিকারী শিল্প কারখানার পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের একমাত্র প্রযুক্তি হলো Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপন করা। শিল্প প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত পরিশোধন ব্যবস্থা গড়ে তোলা ব্যতিত শিল্পে ছাড়পত্র প্রদান কিংবা নবায়ন করা হচ্ছে না। এ ছাড়া ইটিপি স্থাপনে শিল্প মালিকদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর বিভিন্ন সময় শিল্প মালিকদের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন করে। ফলে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ১৯০ টি শিল্পকারখানায় ইটিপি স্থাপনসহ দেশে মোট ১১৫১টি (মোট তরল বর্জ্য নির্গমনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ৭৪.০২%) ইটিপি স্থাপিত হয়েছে এবং আরো ১৮১ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইটিপি স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

চিত্রঃ টেক্সটাইল শিল্পে ইটিপি স্থাপন

হাজারিবাগের চামড়া শিল্প সাভারে স্থানান্তর

বুড়িগঙ্গা নদীর পানি দূষণের অন্যতম কারণ হাজারীবাগ এলাকায় অবস্থিত ট্যানারীর শিল্পের বর্জ্য। শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে শিল্পসমূহ কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপনপূর্বক ঢাকার বাহিরে সাভারের হরিণধারায় অবস্থিত ঢাকা চামড়া শিল্প নগরীতে স্থানান্তর করা হচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তর ট্যানারী শিল্পকারখানাসমূহকে স্থানান্তরের জন্য শিল্প মালিকদের তাগাদা প্রদান করছে এবং শিল্প স্থানান্তর বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়কে কারিগরী সহায়তা প্রদান করছে। এ ছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তর হাজারীবাগস্থ চামড়া শিল্প মালিকদের সাভারে শিল্প স্থানান্তরের জন্য চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করে শিল্প বর্জ্য হতে নদী দূষণ হ্রাসের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর Zero Discharge নীতি গ্রহণ করেছে। এ ক্ষেত্রে ছাড়পত্রে শর্ত হিসেবে শিল্প কারখানার নিকট হতে Zero Discharge পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তর হতে মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত ৭৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের Zero Discharge পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়েছে।

চিত্রঃ পরিবেশ অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনকল্পে শিল্প মালিকদের সাথে আয়োজিত মতবিনিময় সভা।

মেঘনা নদী হতে ঢাকা শহরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পানির গুনগতমান পরিবীক্ষণ

পরিবেশ অধিদপ্তরে বাস্তবায়নাধীন স্ট্রেনদেনিং মনিটরিং এ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট ইন দ্যা মেঘনা রিভার ফর ঢাকাস সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই শীর্ষক প্রকল্পটি মোট টাকা ঃ ১১৬১.৩০ লক্ষ (জিওবি ইনকাইন্ড ৩৮৭.১০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৭৭৪.২০ লক্ষ টাকা) ব্যয়ে জুলাই ২০১৫ -জুন ২০১৭ মেয়াদে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির অর্থায়নকারী সংস্থা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো মনিটরিং এবং এনর্ফোসমেন্ট কৌশল শক্তিশালী করার মাধ্যমে মেঘনা নদী হতে ঢাকা শহরে পানি সরবরাহ দীর্ঘ মেয়াদে পানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারকে সহযোগীতা প্রদান করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। সার্বিক উদ্দেশ্য ঃ (ক)পানি দূষণ ম্যাপ তৈরী, মেঘনা নদীর প্রস্তাবিত পানি উত্তোলন এলাকায় মনিটরিং ও রিপোর্টিং পদ্ধতি শক্তিশালী করণ; (খ) দূষণমাত্রা নিয়ন্ত্রনে শিল্প কারখানাসমূহকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য পরীক্ষামূলক পুরস্কার বা প্রনোদনা প্রদানের পদ্ধতি উদ্ভাবন; (গ) মেঘনা নদীর সংশ্লিষ্ট স্থান পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করণের সম্ভাবতা ও অবস্থান নিরুপন; (ঘ) সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তা এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের ল্যাব স্টাফদের কারিগরী দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান। সেই সাথে প্রস্তাবিত পানি সংগ্রহের স্থানের আশপাশে আবাসন উন্নয়ন, দূষণকারী শিল্প কারখানা এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক বিদ্যমান এবং ভবিষ্যৎ কর্মকান্ড দ্বারা দূষনের উৎস চিহ্নিত করন। প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমঃ (ক) প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান এবং ভবিষ্যৎ দূষনের উৎস চিহ্নিত করণ; (খ) চিহ্নিত দূষণ উৎসে একক এবং সম্বলিত দূষনের প্রভাবের মাত্রা নির্নয় এবং দূষণ নিয়ন্ত্রনের উপায় সনাক্তকরণ; (গ) পরিবেশ অধিদপ্তরের আওতায় চিহ্নিত উৎসসমূহ GIS এর মাধ্যমে অন্তর্ভূক্ত করণ; (ঘ) বিদ্যমান নীতিমালা এবং আইনী কাঠামো নির্ধারণ; (ঙ) খসড়া নীতিমালা, আইন কানুন এবং মানমাত্রা নির্ধারণ এবং সরকারের নীতিগত অনুমোদনে সহযোগীতাকরণ; (চ) শিল্প কারখানাগুলোকে তাদের দূষণ প্রশমনের জন্য প্রদেয় পারিতোষিকের উন্নয়ন; (ছ) পরিবেশ দূষণ ও পরিষ্কারকরণ অনুরোধ বাস্তবায়নের জন্য কারিগরী নিরিক্ষা ও কারিগরী উপদেশ প্রদান; (জ) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য প্রাপ্তি ও শিক্ষা পর্যালোচনা করা; (ঝ) কোন এলাকার পরিবেশগত গুরুত্ব ও অর্থনৈতিক মূল্য অনুধাবনের জন্য পটভূমি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা; (ঞ) যদি পটভূমি পর্যবেক্ষণ পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয় তবে সেই এলাকার জন্য খসড়া আইন ও বিধি তৈরী করা; (ট) এই খসড়া অনুমোদন ও বাস্তবায়নের জন্য গ্রাহকের সাথে আলোচনা করা; (ঠ) পরিবেশ অধিদপ্তরের দক্ষতার ঘাটতি চিহ্নিতকরণ; (ড) DoE, LGB, সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও জনগনের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচীর আরও উন্নয়ন করা; (ঢ) দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন করা এবং গ্রাহকের সাথে আলোচনাসভা ও জনসচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণ করা; এ প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হলো: (১) ইনসেপশন কর্মশালা আয়োজন। এতে সরকারি/বেসরকারি সংস্থার ১৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন ;(২) প্রকল্প এলাকায় দূষণকারী শিল্প কারখানা এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড দ্বারা নদী দূষণের উৎস চিহ্নিত করা হয়েছে;(৩) পানির মানমাত্রার পরিবীক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে; (৪) Industrial Audit কার্যক্রম চলমান রয়েছে; (৫) GIS Mapping কার্যক্রম চলমান রয়েছে; (৬) ECA-ঘোষণা সংক্রান্ত সম্ভ্যাবতা সমীক্ষার উপর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কার্যক্রম

জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্ব সভ্যতার জন্য হুমকিস্বরূপ। জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম বিরূপ প্রভাব হচ্ছে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। গত ১০০ বছরে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে ১৭ থেকে ২১ সেন্টিমিটার (IPCC AR5)। সমুদ্র উপকূল এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রতিকূল প্রভাবগুলোর কারণে বাংলাদেশ নাজুক পরিস্থিতির শিকার। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, ঝুঁকিসমূহ ও বিপন্নতা অভিযোজন এবং সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ব্যাপারে সমীক্ষা ও মূল্যায়নের ফলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বাংলাদেশ হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বিপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম।'জার্মান ওয়াচ' কর্তৃক প্রকাশিত 'বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি সূচক ২০১৬' অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগের সর্বোচ্চ ঝুঁকি সূচকে ৬ নম্বরে বাংলাদেশের অবস্থান। বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নাজুক অর্থনীতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিক নির্ভরশীলতা এ বিপন্নতা বাড়িয়ে দিয়েছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) কর্তৃক জুন ২০১৪-এ প্রকাশিত গবেষণায় দেখা গেছে যে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বিশ্ব সম্প্রদায় যদি কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তাহলে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জিডিপির প্রায় ২ শতাংশ এবং ২১০০ সাল নাগাদ প্রায় ৯.৪ শতাংশ ক্ষতি হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিপর্যয় হতে রক্ষার জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে পরিবেশ অধিদপ্তর নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত 'প্যারিস চুক্তি' স্বাক্ষর

২২ এপ্রিল ২০১৬ তারিখ নিউয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত 'প্যারিস চুক্তি' একটি ঐতিহাসিক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে বাংলাদেশসহ জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশন (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC)-এর ১৯৫টি সদস্য দেশের মধ্যে ১৭৫টি সদস্যই (১৭৪টি সদস্য রাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন) স্বাক্ষর করেছে, যা সংখ্যার দিক দিয়ে কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে একটি অনন্য রেকর্ড। বাংলাদেশ হতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এম.পি. প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশন-এর আওতায় গত ১২ ডিসেম্বর ২০১৫ ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ২১তম জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন (COP21/CMP11)-এ ঐতিহাসিক প্যারিস চুক্তি (Paris Agreement) সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। আলোচ্য বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনটি বাংলাদেশসহ বিশ্বসম্প্রদায়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমন্ডিত ছিল। এ সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এম.পি.-এর নেতৃত্বে ৩৯ সদস্যের একটি দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের অংশ হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তর সম্মেলনে বিভিন্ন ইস্যু ভিত্তিক আলোচনায় বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অত্যন্ত বিপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের পক্ষে কার্যকর ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি প্রাক-শিল্পায়ন সময়ের তুলনায় ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশ নিচে (well below) সীমিত রাখতে হবে এবং ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমিত রাখার জন্য প্রচেষ্ঠা গ্রহণ করা হবে। উল্লেখ্য যে, প্যারিস চুক্তিটি আগামী ২০২০ এরপর কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে। তবে পৃথিবীর গ্রীনহাউজ গ্যাসের অন্তত ৫৫ শতাংশ নির্গমণ করে এরূপ অন্তত ৫৫ টি দেশ কর্তৃক অনুসমর্থনের শর্ত, ২০২০ সালের আগে পূরণ হলে এর আগেও চুক্তিটি কার্যকর হতে পারে। প্যারিস চুক্তিটি কার্যকর হলে বাংলাদেশ অভিযোজন কার্যক্রম বাস্তবায়নে অধিকতর আর্থিক সহায়তা পেতে

কপ-২১ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এম.পি., মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

২২ এপ্রিল ২০১৬ তারিখ নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে বাংলাদেশের পক্ষ হতে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি স্বাক্ষর করছেন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এম.পি।

পারে। পাশাপাশি অভিযোজন এবং প্রশমন কার্যক্রমের জন্য প্রযুক্তিগত এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক সহায়তা পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক অংগনে অর্জন

পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশের অগ্রগতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যাপকভাবে স্বীকৃতিলাভ করেছে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অসামান্য অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা Policy Leadership ক্যাটাগরীতে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার 'Champions of the Earth' অর্জন করেছেন। এছাড়াও জাতিসংঘ কর্তৃক গঠিত High Level Panel on Water-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা -কে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তর্জাতিক নেগোসিয়েশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ UNFCCC-এর আওতায় গঠিত Green Climate Fund (GCF), Executive Committee on Loss & Damage, Adaptation Fund Board (AFB) এবং Consultative Group of Experts (CGE) - এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক Climate Change Negotiation-এ ৪৮টি স্বল্পোন্নত দেশের গ্রুপ LDC-এর অন্যতম সমন্বয়ক (Coordinator) হিসাবে কাজ করছে। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বৈশ্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে এই জোটের মতামতকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়, যা গত প্যারিস সম্মেলনে প্রতিফলিত হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু অভিযোজন এবং প্রশমন প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ক কার্যক্রম

Climate Technology Centre and Network (CTCN)ঃ উন্নত দেশগুলো হতে উন্নয়নশীল দেশসমূহে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন এবং প্রশমন সংক্রান্ত প্রযুক্তি হস্তান্তর ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে UNFCCC-এর অধীনে Climate Technology Centre and Network (CTCN) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। CTCN-এর সাথে জাতীয় পর্যায়ে উক্ত প্রযুক্তি স্থানান্তরে সমন্বয় সাধনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরকে National Designated Entity (NDE) এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে NDE Focal Point হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে। CTCN-এর আওতায় প্রযুক্তি হস্তান্তর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে UNEP-এর সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক "Request Incubator Programme" গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ সময়ে উল্লিখিত বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

(১) উক্ত প্রোগ্রামের আওতায় প্রয়োজনীয় Technology চিহ্নিতকরণ এবং এ সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবনা প্রস্তুতের লক্ষ্যে National Consultation Workshop অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(২) কর্মশালার আলোকে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা হতে ৭টি প্রযুক্তি স্থানান্তরের অনুরোধ পাওয়া গেছে। উক্ত প্রস্তাবসমূহের প্রাথমিক যাচাই বাছাই সম্পন্ন হয়েছে। আশাকরা যায়, আগামী আগস্ট মাসের মধ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণায়য়ের সচিবকে সভাপতি ও পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে সদস্য-সচিব করে গঠিত National CTCN Committee কর্তৃক সুপারিশকৃত অভিযোজন এবং প্রশমন প্রযুক্তি স্থানান্তরের অনুরোধসমূহ CTCN-এর Technical Assistance এর লক্ষ্যে CTCN -এ প্রেরণ করা হবে। ।

Joint Crediting Mechanism (JCM)ঃ জাপান সরকার কর্তৃক গৃহীত Joint Crediting Mechanism (JCM)-এর আওতায় বাংলাদেশ সরকার জাপান হতে বিদ্যুৎ, জ্বালানী, শিল্প ও অন্যান্য খাতে স্বল্প কার্বন নিঃসরণযোগ্য প্রযুক্তি, পণ্য, সেবা ও অবকাঠামো নির্মাণ/প্রচলনে সহায়তা লাভ করছে যার মূল লক্ষ্য স্বল্প কার্বন নিঃসরণযোগ্য উন্নয়ন নিশ্চিতকরা ও টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখা। JCM-এর আওতায় JCM Model Project **বাস্তবায়নে জাপান সরকার কর্তৃক ৫০% পর্যন্ত অনুদান প্রদানের সুযোগ রয়েছে।** উল্লেখ্য যে, JCM-এর আওতায় বাংলাদেশ সরকার ও জাপান সরকারের মধ্যে ১৯ মার্চ ২০১৩ তারিখে ঢাকায় "Low Carbon Growth Partnership between the Japanese side and the Bangladeshi side" বিষয়ে MoU স্বাক্ষরিত হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর বাংলাদেশে JCM সচিবালয় হিসাবে কাজ করছে। ২০১৫-২০১৬ সময়ে JCM সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

(১) JCM প্রকল্প গ্রহণে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোক্তাগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ইতোমধ্যে ০৩টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে;

(২) JCM বিষয়ক একটি চার্ট বা সহায়ক পুস্তিকা প্রণয়ন করা হয়েছে;

(৩) **প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রমঃ** জাপানের সহায়তায় বাংলাদেশে ইতোমধ্যে ২টি প্রযুক্তি হস্তান্তরের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে -

(ক) Energy saving for air conditioning & facility cooling by high-efficiency centrifugal chiller at City Sugar Mills, Narayanganj.

(খ) Introduction of PV-diesel Hybrid System at Fastening Manufacturing Plant, YKK Corporation, YKK Bangladesh, at Ashulia, Dhaka.

(৪) JCM-এর আওতায় আরও ০৩টি প্রযুক্তি হস্তান্তরের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

Clean Development Mechanism (CDM)ঃ কিয়োটো প্রটোকলের আওতায় গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে দু'স্তর বিশিষ্ট Designated National Authority (DNA)-র অংশ হিসাবে জাতীয় সিডিএম বোর্ড এবং জাতীয় সিডিএম কমিটি গঠন করেছে। ২০১৫-২০১৬ সময়ে জাতীয় সিডিএম বোর্ড (National CDM Board) এর সভাপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব-এর সভাপতিত্বে জাতীয় সিডিএম বোর্ডের ১০ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং উক্ত সভায় বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে দুইটি এবং আধুনিক প্রযুক্তির ইট উৎপাদন খাতে দুইটি সিডিএম প্রকল্প অনুমোদন লাভ করেছে। উল্লেখ্য যে, DNA এ পর্যন্ত মোট ২১ টি CDM প্রকল্প অনুমোদন করেছে এবং তন্মধ্যে ১৩ টি প্রকল্প জাতিসংঘের CDM Executive Board হতে Registration পেয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণঃ জার্মান দাতা সংস্থা GIZ-এর সহায়তায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণে কৃষি, পানি, অবকাঠামো ও স্বাস্থ্যখাতে দেশব্যাপী (৬৪ টি জেলায়) এবং সেক্টরভিত্তিক vulnerability assessment করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কৃষি, পানি, অবকাঠামো ও স্বাস্থ্যখাতে জাতীয় পর্যায়ে তিনটি এবং উপকূলীয় অঞ্চল, বন্যা ও খরা প্রবণ এলাকায় Hot Sopt Based দুইটি vulnerability assessment প্রণয়ন করা হবে। ২০১৫-২০১৬ সময়ে উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

(১) উক্ত কার্যক্রমের আওতায় GIZ-এর সহায়তায় ইতোমধ্যে International এবং National Expert নিয়োগ করার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

(২) এছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও অংশীজনগণের অংশগ্রহণে Result Based Monitoring (RBM) বিষয়ক একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

(৩) সামগ্রিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তরে একটি GIS ল্যাবরেটরীও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড হতে সরাসরি অর্থ প্রাপ্তির উদ্যোগঃ বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশ সরকার United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এর আওতায় গঠিত গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড হতে সরাসরি অর্থ প্রাপ্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সরকার কর্তৃক Economic Relations Division (ERD)-কে গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ডের National Designated Entity (NDA) হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। NDA-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইতোমধ্যে গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ডে Accreditation -এর জন্য অন্য দুটি সংস্থার সাথে পরিবেশ অধিদপ্তর অনলাইনে আবেদন দাখিল করেছে। গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ডে Accreditation এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে GIZ-এর সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তরের সামগ্রিক আর্থিক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

চিত্র: জাতীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথি বেগম মতিয়া চৌধুরী, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়, বিশেষ অতিথি জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, জনাব আনিসুল হক, মাননীয় মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, জনাব মোহাম্মদ সাঈদ খোকন, মাননীয় মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং সভাপতি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

জ্বালানী দক্ষতা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মশালা

২২ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে জাতীয় সিডিএম বোর্ডের আওতায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং সংস্থা প্রধানদের অংশগ্রহণে প্রধান অতিথি হিসাবে জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর উপস্থিতিতে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য-সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে Clean Development Mechanism

(CDM) and Low Carbon Developments Potentials in Different Sectors in Bangladesh বিষয়ক একটি সেমিনার এর আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সেমিনারে Power Division কর্তৃক যেসব Power Plant-এর Energy efficiency 50% এর কম তার একটি তালিকা প্রণয়ন, BCIC-এর আওতায় যে সব কারখানা আছে তার Energy efficiency বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দাখিল এবং পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক Energy efficiency বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডাদের নিয়ে জাতীয় CDM বোর্ডের একটি সভা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

জাতীয় CDM বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৩ মার্চ ২০১৬ তারিখে জাতীয় সিডিএম বোর্ডের সভাপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য-সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে জাতীয় সিডিএম বোর্ডের আওতায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জাতীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বেগম মতিয়া চৌধুরী, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, জনাব আনিসুল হক, মাননীয় মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, জনাব মোহাম্মদ সাঈদ খোকন, মাননীয় মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়। এ কর্মশালার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে অতিদ্রুত সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম ও প্রকল্প বাস্তবায়ন

সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা

সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও ঝুঁকি নিরূপনের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক "Assessment of Sea Level Rise and Vulnerability in the Coastal Zone of Bangladesh through Trend Analysis" শীর্ষক একটি গবেষণা Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS), Institute of Water and Flood Management (IWFM) of BUET এবং Institute of Water Modelling (IWM) এর কারিগরি সহায়তায় প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত গবেষণা প্রতিবেদনে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ এবং চট্টগ্রাম এবং মংলা বন্দরের টাইডাল গেজ (Tidal Gauge) স্টেশনের বিগত ৩০ বছরের উপাত্ত (Data) নিয়ে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রবনতা বিশ্লেষণ (Trend Analysis) করা হয়েছে। উক্ত গবেষণা হতে দেখা যায় যে, নিম্ন গাঙ্গেয় পললভূমি, মেঘনা মোহনা পললভূমি এবং চট্টগ্রাম উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার গড়ে প্রতি বছর ৬-২১ মিলিমিটার। এই প্রথম দেশীয় তিনটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে। বর্ণিত প্রতিবেদনটি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবে বাংলাদেশের ঝুঁকি নিরূপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং আন্তর্জাতিক নেগোসিয়েশনে বাংলাদেশের পক্ষে একটি দালিলিক প্রমান হিসেবে কাজ করবে।

চিত্রঃ গত ২৯ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে "Assessment of Sea Level Rise and Vulnerability in the Coastal Zone of Bangladesh through Trend Analysis" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের উপর আয়োজিত Sharing Workshop এ উপস্থিত থেকে পরামর্শ ও তথ্য বিনিময় মূলক বক্তব্য রাখছেন ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়; মঞ্চে উপবিশ্ট আছেন জনাব মোঃ রইছউল আলম মন্ডল, মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ড. আইনুন নিশাত, অধ্যাপক ইমেরিটাস, ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞবৃন্দ।

থার্ড ন্যাশনাল কমিউনিকেশন (টিএনসি) প্রণয়ন

Global Environment Facility (GEF) এর অর্থায়নে UNDP Bangladesh এর সহায়তায় ''বাংলাদেশ : থার্ড ন্যাশনাল কমিউনিকেশন (টিএনসি) টু দি ইউএনএফসিসিসি" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ সরকারের voluntary obligation হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রাসংগিক তথ্যাদি সমৃদ্ধ থার্ড ন্যাশনাল কমিউনিকেশন (টিএনসি) প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হচ্ছে যা পরবর্তীতে

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এ পেশ করা হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভোগ ও সমস্যা হতে দেশকে সুরক্ষাকরণ ও দেশে জলবায়ু সহনশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করাও এই প্রকল্পের একটি উদ্দেশ্য। তাছাড়া Green House Gas Inventory প্রস্তুত করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধিকরণে সহায়তা করণও এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

প্রকল্পের ৫ (পাঁচ) টি Component/Chapter এর উপর ৫ (পাঁচ) টি খসড়া চুড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণীত হবার পর ৩ জন জাতীয় পরামর্শক (নিরীক্ষক) কর্তৃক প্রতিবেদনগুলি নিরীক্ষা (review) করা হবে এবং ৫টি চুড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হবে। অত:পর একজন জাতীয় পরামর্শক (সংকলন) এর মাধ্যমে উক্ত ৫ (পাঁচ) টি চুড়ান্ত প্রতিবেদন সংকলন (compile) করে একটি মূল প্রতিবেদন "Bangladesh: Third National Communication (TNC) to the UNFCCC" প্রণয়ন করা হবে যা আগামী এপ্রিল/মে ২০১৭ এর মধ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে UNFCCC এ পেশ করা হবে।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম ও অগ্রগতি

- গত ১১ আগষ্ট ২০১৫ তারিখে CIRDAP মিলনায়তনে প্রকল্পের Inception Workshop আয়োজন করা হয়েছে, যাতে UNDP- সহ সরকারী, বেসরকারী ও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ১১৫ জন প্রতিনিধি / বিশেষজ্ঞ অংশগ্রহণ করেছেন।
- গত ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভায় জুন ২০১৫ পর্যন্ত প্রকল্প ব্যয়এবং বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়েছে।
- পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে ৬ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে প্রকল্পের প্রথম স্টিয়ারিং কমিটির একটি সভা আয়োজন করা হয়।
- ০৬ - ০৭ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে USAID ও USEPAএর সহযোগিতায় "Use of the new ALU software in Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) Sector" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই প্রশিক্ষণে পরিবেশ অধিদপ্তরসহ ৭টি প্রতিষ্ঠানের মোট ১৯ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।
- প্রকল্পের Activity/ Component-1: National Circumstances এর উপর জানুয়ারী '১৬ মাসে একটি Mid-term report (প্রতিবেদন) প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ০৯-১১ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ তারিখে USAID ও USEPA এর সহযোগিতায়"Development of GHG Inventory on Energy, Industrial Process & other Product use and Waste sector" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই প্রশিক্ষণে পরিবেশ অধিদপ্তরসহ ১২টি প্রতিষ্ঠানের মোট ২৭ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।
- গত ০৭মার্চ ২০১৬ তারিখে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভায় মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের কার্যাবলীর অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- গত মার্চ/এপ্রিল ২০১৬ সময়ে প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৫টি Interim Report জমা দেয়া হয়েছে।
- মে '১৬ মাসে UNDP র জন্য Mid Year Review সংক্রান্ত বিভিন্ন ডকুমেন্টস এবং AWP revision সংক্রান্ত ডকুমেন্টস প্রস্তুত করা হয়।
- Activity/ Component-1 : National Circumstances এর উপর ১ টি Draft Final Report (প্রতিবেদন) প্রণয়ন করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মে'১৬ মাসে জমা দেওয়া হয়েছে।
- প্রকল্পের ৬টি Core Sectoral Working Group (CSWG) - এর ৯ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ওজোন স্তর সংরক্ষণ ও মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

১৯৮৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে স্ট্রাটোস্ফিয়ারিক স্তরে অবস্থিত ওজোনস্তরকে রক্ষার জন্য জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি ও বিজ্ঞানীদের সময়োচিত তৎপরতায় কানাডার মন্ট্রিল শহরে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সামগ্রী ফেজ আউট করার লক্ষ্যে "মন্ট্রিল প্রটোকল" স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ সরকার ১৯৯০ সালের ২ আগষ্ট মন্ট্রিল প্রটোকল চুক্তি অনুস্বাক্ষর করে এবং ১৯৯৪ সালের ১৮ মার্চ লন্ডন সংশোধনী অনুমোদন করে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ২০০০ সালে কোপেনহেগেন সংশোধনী, ২০০১ সালে মন্ট্রিল সংশোধনী এবং ২০১০ সালে বেইজিং সংশোধনী অনুমোদন করে।

মন্ট্রিল প্রটোকল সফল বাস্তবায়নে সরকারকে বিশেষজ্ঞ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিবকে চেয়ারম্যান করে "ওজোনস্তর ক্ষয়কারী বস্তুসামগ্রী সংক্রান্ত জাতীয় কারিগরী কমিটি" (National Technical Committee on Ozone-Depleting Substances) এবং প্রটোকলের পালনীয় শর্তাদি মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে চেয়ারম্যান করে 'ওজোন সেল' গঠিত হয়।

মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রীর ব্যবহার ও আমদানি সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশে একটি প্রাথমিক জরিপ পরিচালনা করা হয় এবং এ জরিপের ভিত্তিতে ১৯৯৪ সালে কান্ট্রি প্রোগ্রাম প্রস্তুত করা হয় এবং ২০০৫ সালে উক্ত কান্ট্রি প্রোগ্রাম আপডেট করা হয়। মন্ট্রিল প্রটোকলের মন্ট্রিল সংশোধনী অনুযায়ী ২০০৯ ও ২০১০ সালে এইচসিএফসি-র গড় ব্যবহার ভিত্তি নির্ধারণ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর ২০১১ সালে এইচসিএফসি ফেজ আউট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (এইচপিএমপি) প্রনয়ণ করে যা মন্ট্রিল প্রটোকল মাল্টিলেটারেল ফান্ডের ৬৫তম নির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদন লাভ করেছে। ২০০৪ সালে ওডিএস-এর আমদানি ও ব্যবহার-এর পর্যায়ক্রমিক হ্রাসের লক্ষ্যে ওডিএস বিধিমালা জারি করা হয়। সেপ্টেম্বর ২০১৪ সময়ে "ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪" সংশোধন করা হয়। এর ফলে বিধিমালায় এইচসিএফসি-র আমদানি, রপ্তানি ও ব্যবহারের বিষয়টি পুনঃনির্ধারিত হয় এবং ঔষধশিল্পে সিএফসি-এর পুনঃব্যবহার রহিত হয়। ১ জানুয়ারি ২০১০ হতে সিএফসি, কার্বনটেট্রাক্লোরাইড ও মিথাইলক্লোরোফরম সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়। ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর ঔষধ শিল্প হতে সিএফসি-এর ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা হয়েছে।

ওজন স্তর রক্ষায় বর্তমানে পরিবেশ অধিদপ্তরে ক) রিনিউয়াল অব ইনষ্টিটিউশনাল ষ্টেনদেনিং ফর দি ফেজ আউট অব ওজোন ডিপ্লেটিং সাবস্টেন্সেস (ফেজ-৭) এবং খ) ইমপ্লিমেনটেশন অব এইচসিএফসি ফেজ-আউট ম্যানেজমেট প্ল্যান ইউএনইপি-কম্পোন্যান্ট (স্টেজ-১) নামক দুইটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রথম প্রকল্পটির মাধ্যমে বাংলাদেশে মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরে গঠিত ওজোন সেলের কর্মকান্ড অব্যাহত রাখার জন্য এবং কান্ট্রি প্রোগ্রাম-এ বর্ণিত ওজোন ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রীর আমদানী ও ব্যবহার পর্যায়ক্রমিক হ্রাস করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন এবং পরিচালনা করা হচেছ এবং দ্বিতীয় প্রকল্পের মাধ্যমে মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রিফ্রিজারেশন সেক্টরে কর্মরত টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণ প্রদান; সার্ভিসিং সেক্টরে কর্মরত টেকনিশিয়ানদের জন্য Code of Practice প্রণয়ন ও বিতরণ; ওডিএস এর আমদানী- রফতানী নিয়ন্ত্রণ ও চোরাচালান রোধের জন্য কাস্টমস ও সংশ্লিষ্ট আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রয়োজনীয় Identifier সরবরাহ; এবং ওজোনস্তর ক্ষয়রোধের লক্ষ্যে আমদানীকারক, ব্যবহারকারী ও জনগণের মধ্যে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রকল্প দুটি বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশে মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়ন কার্যক্রম অক্ষুন্ন থাকবে।

আর্ন্তজাতিক ওজন দিবস উদযাপন

১৬ সেপ্টম্বর আন্তর্জাতিক ওজন দিবস। ওজন স্তর সংরক্ষণে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর দিবসটি পালনে নানা কর্মসূচী গ্রহণ করে। দিবসটি পালনের জন্য ওজন স্তরের গুরুত্ব ও করণীয় বিষয়ে আলোচনা সভা, রচনা প্রতিযোগিতা ও শিশু-কিশোরদের জন্য চিত্রাংকন প্রতিযোগিতাসহ নানা কর্মসূচী পালন করা হয়। ২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক ওজন দিবস ও নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়।

চিত্রঃ আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস ২০১৫ উপলক্ষে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার বিজয়ী

পরিবেশগত ছাড়পত্র

পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও ছাড়পত্র নবায়ন প্রদান কার্যক্রম

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ জারী হওয়ার পর হতে বাংলাদেশে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত হয়। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার এই আইনের ২০ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯৯৭ সালে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (Environment Conservation Rules, 1997) জারী করে। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ১২(১) ধারা মোতাবেক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে মহাপরিচালকের নিকট হতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কোন শিল্প বা প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য Effluent Treatment Plant (ETP) ও বায়বীয় বর্জ্য পরিশোধনের জন্য Air Treatment Plant (ATP) স্থাপন এবং কঠিন ও অন্যান্য ক্ষতিকর বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া জরুরী।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর বিধি ৭ এ পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার এবং অবস্থান অনুযায়ী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহ-কে নিম্নবর্ণিত ০৪ (চার) টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে -

১. **সবুজ**
২. **কমলা-ক**
৩. **কমলা-খ**
৪. **লাল**

সকল শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ছাড়পত্রের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র, সাধারণ তথ্যাবলী, লোকেশন ম্যাপ, লে-আউট প্ল্যান, মূলধন অনুযায়ী নির্ধারিত ছাড়পত্র ফি এবং শিল্প প্রকল্পের প্রকৃতি অনুযায়ী অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ে অন লাইনে আবেদন করা প্রয়োজন। তবে, মহানগর কার্যালয়ের আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ছাড়পত্রের জন্য ঐ মহানগর কার্যালয়ে আবেদন করতে হয়। এছাড়া, যে সকল প্রকল্পের কার্যক্রম একাধিক জেলা নিয়ে গঠিত সে সকল ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাগণ সরাসরি বিভাগীয় কার্যালয়ে এবং একাধিক বিভাগ নিয়ে গঠিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে সরাসরি সদর দপ্তরে আবেদন গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

চিত্র: পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সিরাজগঞ্জ জেলায় বাস্তবায়িতব্য River Management Improvement Project এর EIA অনুমোদনের পূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র কমিটি কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন।

সবুজ শ্রেণীভূক্ত প্রস্তাবিত এবং বিদ্যমান সকল শিল্প ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে সরাসরি পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। অপরদিকে, কমলা-ক ও কমলা-খ শ্রেণীর প্রকল্প ও শিল্পের জন্য প্রথমে অবস্থাগত এবং পরে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। এছাড়া, লাল শ্রেণীভূক্ত প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রথমে অবস্থানগত ও পরবর্তীতে ইআইএ অনুমোদন এবং সবশেষে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সকল জেলা অফিস সবুজ ও কমলা-ক শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের অনুকূলে সরাসরি অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র অনুমোদন ও প্রদান করে থাকে। বিভাগীয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ কমলা-খ

শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয় ঐ শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করে থাকে। তবে, মহানগর কার্যালয়ের ক্ষেত্রে সবুজ, কমলা-ক ও কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে সরাসরি অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র অনুমোদন ও প্রদান করা হয়ে থাকে।

লাল শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ছাড়পত্রের অনুমোদন মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধন ২০১০) এর ১২(৪) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে মহাপরিচালককে এ বিষয়ে সহায়তা প্রদানের জন্য সদর দপ্তরে একটি কারিগরী কমিটি রয়েছে। কমিটি সময় সময় পরিবেশ অধিদপ্তরের অঞ্চল, বিভাগ ও মহানগর কার্যালয় কর্তৃক সুপারিশকৃত ছাড়পত্রের আবেদনসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক ছাড়পত্রের বিষয়ে মহাপরিচালকের নিকট সুপারিশ পেশ করে। পরবর্তীতে মহাপরিচালকের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে সুপারিশমালা/সিদ্ধান্তসমূহ সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে এবং পরিবেশ অধিপ্তরের ওয়েসাইটে প্রেরণ করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে জেলা কার্যালয় হতে ছাড়পত্র প্রদানসহ পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। সদর দপ্তরের ন্যায় পরিবেশ অধিদপ্তরের অঞ্চল, বিভাগ ও মহানগর কার্যালয়েও একটি করে কারিগরী কমিটি রয়েছে এবং উক্ত কমিটিসমূহ তাদের কার্যালয়ের অধিভূক্ত কমলা-ক ও কমলা-খ শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ছাড়পত্র অনুমোদন এবং কমলা-ক, কমলা-খ এবং লাল শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান/ছাড়পত্র নবায়ন করে থাকে।

২০১০-২০১৫ সাল পর্যন্ত সারা দেশে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়নের তথ্য সারণী ঃ

বছর (জানুয়ারী-ডিসেম্বর)	ছাড়পত্র প্রদান	ছাড়পত্র নবায়ন
২০১০	৪,৯৮৭	৫,২৯৮
২০১১	৫,৪৩৬	৭,৪৬৪
২০১২	৬,২৮২	৬,৬৪৭
২০১৩	৬,৯৯৮	৭,১২৩
২০১৪	৫,৮৬৭	৯,৩১৪
২০১৫	৬,২৬৪	৯,৯৯২
মোট =	**৩৫,৮৩৪**	**৪৫,৮৩৮**

অনলাইন ভিত্তিক ছাড়পত্র প্রদান

বর্তমান সরকার রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন তথা জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০০৯ অনুসরণে বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে উন্নীত করতে সকল ক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার ও সম্প্রসারণের উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তরও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে সকল কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে এর বাস্তবায়নে অঙ্গিকারাবদ্ধ এবং এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ছাড়পত্র প্রদান ও ছাড়পত্রজারী সেবাকে অনলাইনে প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয় ২০১৫ সাল হতে। অনলাইন ভিত্তিক সেবা কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য হলো- ছাড়পত্র সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ, সেবা প্রদানের সময় হ্রাস এবং দূর্নীতি হ্রাস। বর্তমানে উদ্যোক্তা তাঁর নিজ কার্যালয় থেকে ছাড়পত্রের আবেদন দাখিল করতে পারেন এবং তা অনলাইর মনিটর করতে পারেন। বর্তমানে প্রচলিত ম্যানূয়েল পদ্ধতিতে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রক্রিয়া করতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হওয়ায় এবং কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডার না থাকায় সরকারী প্রয়োজনে বা তথ্য অধিকার আইনে বা অন্য যে কোন জরুরী প্রযোজনে স্বল্প সময়ে চাহিদা মোতাবেক কোন তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়ে উঠে না। এছাড়া, মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি ও স্বচ্ছতা নিয়েও অনেক সময় প্রশ্ন দেখা দেয়। এ সমস্যা থেকে উত্তোরণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Access to Information (A2I) প্রকল্পের সহযোগিতায় পরিবেশ অধিদপ্তরে পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদনপত্র অনলাইনের মাধ্যমে গ্রহণের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। গত ০৮/০৪/২০১৫ তারিখে মাননীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রী, উপমন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে পরিবেশ অধিদপ্তরে এই অনলাইন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

অনলাইনে ছাড়পত্র নিষ্পত্তি বিষয়ক তথ্য

প্রকল্পের ধরণ	প্রাপ্ত আবেদন	ছাড়পত্র প্রদান	প্রক্রিয়াধীন	আবেদন খারিজ
সবুজ	২২২	৭৯	১৩৩	১০
কমলা (ক)	৫,৩৮৩	৩,৪৬৫	১,৮৩৪	৮৪
কমলা (খ)	১১,৬০৩	৫,১৭১	৬,২৭২	১৬০
লাল	২,৪৭৯	৮০০	১,৬২৫	৫৪

জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আই টি ইউ) কর্তৃক প্রদত্ত সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (WSIS) অ্যাওয়ার্ড অর্জন

জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আই টি ইউ) প্রতি বছর তথ্য খাতে বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানজনক ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (WSIS) অ্যাওয়ার্ড দিয়ে থাকে। ২০১২ সাল থেকে এই অ্যাওয়ার্ডটি পরিচালিত হচ্ছে যেখানে ১৮টি ক্যাটাগরিতে সারা বিশ্ব থেকে প্রাপ্ত শত শত প্রকল্প থেকে শ্রেষ্ঠ প্রকল্পগুলো নির্বাচিত হয়। প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই প্রকল্পের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে ভুমিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। বাংলাদেশ ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে এই বিরল সম্মান পেয়ে এসেছে। ২০১৪ সালে বাংলাদেশ থেকে প্রথমবার "জনগনের দোরগোড়ায় সেবা" নামক প্রকল্পের জন্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম এই অ্যাওয়ার্ডটি পায়। এর পর ২০১৫ সালে "বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য পোর্টাল" নামক প্রকল্পের জন্যে আবারও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম এই অ্যাওয়ার্ডটি পায়। বাংলাদেশকে তৃতীয়বার এই বিরল সম্মান এনে দিতে এটুআই প্রোগ্রাম থেকে ৪টি প্রকল্প প্রেরণ করা হয় যার সবকটই অ্যাওয়ার্ডের জন্যে মনোনয়ন পেয়েছে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেশের ব্যবস্থাপনা

ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস এন্ড লাইভলিহুডস ইন ইসিএ(CREL-ECA)

পরিবেশ অধিদপ্তরে বাস্তবায়নাধীন " **ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস এন্ড লাইভলিহুডস ইন ইসিএ(CREL-ECA)**" শীর্ষক প্রকল্পটি মোট টাকা ঃ ৫২৩৪.০৮ লক্ষ (জিওবি ইনকাইন্ড ১৫৬ লক্ষ, জিওবি ক্যাশ ১০২.২৫ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪৯৭৫.৮৩ লক্ষ টাকা) ব্যয়ে জুলাই ২০১৩ -জুন ২০১৮ মেয়াদে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির অর্থায়নকারী সংস্থা ইউএসএইড। প্রকল্পের মূল **উদ্দেশ্য** ঃ প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন জলাভূমি এলাকার জীববৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে সহব্যবস্থাপনা মডেল প্রয়োগের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠির বিকল্প জীবিকায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক, ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরে ভূমিকা রাখা। সার্বিক উদ্দেশ্য ঃ **১)** ECA এলাকার জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সহব্যবস্থাপনা সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি; ২) ECA ও জলাভূমি নির্ভরশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বিকল্প জীবিকার সংস্থানে সহায়তা প্রদান; ৩) জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল এবং জীববৈচিত্র্য কনভেনশন বাস্তবায়নের ধারায় জলবায়ু সহিষ্ণু সহব্যবস্থাপনা ও আইন ও বিধির মাধ্যমে সার্বিকভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা যাতে আন্তর্জাতিকভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রতিবেশ সংরক্ষিত হয়; ৪) আধুনিক প্রযুক্তি ও সমসাময়িক জ্ঞান ব্যবহার করে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও সার্মথ্য বৃদ্ধি করা; ৫) ECA ও অংশীদার প্রতিষ্ঠানের সার্মথ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে জলবায়ু সহিষ্ণু পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়নের মাধ্যমে অভিযোজন, সংরক্ষণ ও পরিবেশবান্ধব জীবিকায়নের সহায়তা করা; ৬) ECA এলাকায় বা এর আশেপাশে যে কোন স্থাপনা যেন পরিবেশবান্ধব হয় সে লক্ষ্যে কাজ করা। প্রধান কার্যক্রম ঃ **১)** ECA এবং এর আশেপাশের এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন; ২) বিদ্যমান ভিসিজি সদস্যদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান এবং নতুন দল গঠনে সহায়তা করা; ৩) দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা; ৪) Participatory Climate Vulnerability-এর উপর গবেষণা পরিচালনা করা; ৫) ECA এবং এর আশপাশের এলাকার জন্য জলাভূমি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা; ৬) Satellite-based ভূমির ব্যবহার পরিবর্তনের ধরন (Pattern) এনালাইসিস করা এবং জিআইএসভিত্তিক রিসোর্স ম্যাপিং সম্পন্ন করা; ৭) সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোর sustainability এর উপর গবেষণা করা; ৮) ECA এবং এর আশপাশের এলাকার Potential threat assessment করা; ৯) স্টেকহোল্ডারদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; ১০) জলাভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালার আধুনিকায়নে কাজ করা; ১১) জলাভূমি সৃজন ও সংরক্ষণে কাজ করা; ১২) স্থায়ী অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও বিদ্যমান অভয়াশ্রমের টেকসই ব্যবস্থাপনা; এবং ECA ও জলাভূমির জীবভৌত পরিবেশগত অবস্থার উন্নয়ন।

এ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম ঃ

বিগত বছরে ক্লাইমেট-রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস এন্ড লাইভলিহুডস (ক্রেল) প্রকল্প সুন্দরবন ইসিএ এলাকায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে বিবিধ কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসের ভেতর সুন্দরবন ইসিএ এলাকাতে ১৬টি সচেতনতামূলক সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে। মংলা ফেরিঘাটসহ বিভিন্ন জনবহুল গুরুত্বপুর্ন স্থানে এই সাইনবোর্ডগুলো স্থাপিত। এই সাইনবোর্ড গুলো জনগণকে ইসিএ সংরক্ষণে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করবে।

এর পাশাপাশি ক্রেলের কর্ম এলাকায় অবস্থিত নির্ধারিত স্কুল এবং কলেজে সচেতনতামুলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের জীববৈচিত্রের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়েছে। সফর শেষে তারা তাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে দেয়ালিকা প্রকাশ করেছে যাতে অন্যরা জীববৈচিত্র এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারে।

এবছর এলাকার জনগনকে সচেতন করবার জন্য উপজিলা ভিত্তিক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে। এই সভাগুলোতে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত হয়ে খোলাখুলিভাবে উপস্থিত এলাকাবাসির সাথে পরিবেশের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

নিয়মিত কর্মকান্ডের অংশ হিসাবে ক্রেল সুন্দরবন ইসিএ এলাকায় বাসবাসকারি জনগোষ্ঠির বিকল্প জীবিকায়নের জন্য প্রশিক্ষন সহ বিভিন্ন সহযোগীতা করে চলেছে, যা সুন্দরবনের সম্পদের উপর তাদের নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনছে।

আপডেটিং এন্ড মেইনস্ট্রিমিং অব্ ন্যাশনাল বায়োডাইভারসিটি স্ট্র্যাটেজি এন্ড অ্যাকশন প্ল্যান ফর বাংলাদেশ (এনবিস্যাপ)

চিত্র: এনবিএসএপি এর স্টেইকহোল্ডার সভায় বক্তব্য রাখছেন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ।

বাংলাদেশ জাতিসংঘ জীববৈচিত্র্য সনদ (Convention on Biological Diversity, 1992)-এর অংশীদার (Party)। এ সনদের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ২০০৪ সালে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (National Biodiversity Strategy and Action Plan, NBSAP) প্রণয়ন করে। জোহানেসবার্গে ২০০২ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেকসই সম্মেলনে (WSSD) গৃহীত 2010 Biodiversity Targets-কে বিবেচনায় নিয়ে ২০০৪ সালে NBSAP প্রণীত হয়। ২০১০ সালে সিবিডি সেক্রেটারিয়েটে দাখিলকৃত চতুর্থ জাতীয় প্রতিবেদনে (যা স্থানীয়ভাবে Biodiversity National Assessment and Programme of Action 2020 হিসেবে প্রকাশিত হয়) 2010 Biodiversity Targets বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি তুলে ধরা হয়।

২০১০ সালে জাপানের নাগয়ায় অনুষ্ঠিত সিবিডির দশম সভায় (CBD COP-10) বিশ্বব্যাপী জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১১-২০২০ (আইচি বায়োডাইভারসিটি টার্গেটস) গৃহীত হয়। বর্ণিত টার্গেটগুলোর আলোকে NBSAP হালনাগাদ করার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। এ লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট

ফ্যাসিলিটি (জেফ্)-এর সহায়তায় "আপডেটিং এন্ড মেইনস্ট্রিমিং অব্ ন্যাশনাল বায়োডাইভারসিটি স্ট্র্যাটেজি এন্ড অ্যাকশন প্ল্যান ফর বাংলাদেশ (এনবিস্যাপ)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিভাগীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত পরামর্শ কর্মশালার মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারকে গুরুত্ব দিয়ে Biodiversity National Asseessment 2015 এবং National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP), 2016-2021 শীর্ষক ডকুমেন্টসমূহ প্রণীত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত Clearing House Mechanism (CHM) বা ওয়েব-বেইজড তথ্যভান্ডার তৈরি করা হয়েছে। এনবিস্যাপকে উন্নয়ন পরিকল্পনার মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে এটিকে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও, এ প্রকল্পের আওতায় জীববৈচিত্র্য বিষয়ে জনগণের শিক্ষা-সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে জীববৈচিত্র্য বিষয়ক আউটরিচ্ ম্যাটেরিয়াল প্রস্তুত করা হয়েছে, যেগুলো প্রশিক্ষণ-কর্মশালায় বিতরণ করা হয়েছে।

জীব নিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কর্মকাঠামো (আইএনবিএফ) বাস্তবায়ন

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ইউনেপ-জিইএফ এর সহায়তায় গৃহীত "ইমপ্লিমেন্টেশন অব্ দি ন্যাশনাল বায়োসেফটি ফ্রেমওয়ার্ক অভ্ বাংলাদেশ (আইএনবিএফ)" শীর্ষক প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো: বায়োসেফটি ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়নপূর্বক বায়োসেফটি বিষয়ক সামর্থ অর্জন করা। এ প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত কার্যক্রম হলো: (১) পরিবেশ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় গবেষণাগারটিকে আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে জিএমও ডিটেকশন কার্যক্রম পরিচালনার উপযোগী করা হয়েছে; (২) বায়োসেফটি বিষয়ে সক্ষমতা অর্জন ও বায়োসেফটি রেগুলেটরী সিস্টেমের উপর সম্যক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে বিগত ২১-২৫ মার্চ ২০১৬ তারিখে অষ্ট্রেলিয়ায় ১০ জন বিভিন্ন সংস্থার সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের শিক্ষা সফর সম্পন্ন করা হয়েছে; (৩) জাতীয় পর্যায়ে বিগত ১৪ জুন ২০১৫ এবং বিগত ১৪-১৫ জুন ২০১৬ সময়ে অনুষ্ঠেয় কর্মশালার মাধ্যমে Biosafty Policy of Bangladesh এবং Biosafty Monitoring & Enforcement Manual এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।

কমিউনিটি বেইজ্ড অ্যাডাপটেশন ইন দ্য ইকোলজিক্যালী ক্রিটিক্যাল এরিয়াজ থ্রু বায়োডাইভারসিটি কনজারভেশন এণ্ড সোস্যাল প্রটেকশন প্রজেক্ট (সিবিএ-ইসিএ)।

চিত্র: নুনিয়ার ছড়ায় ম্যানগ্রোভ বন সৃজন, কক্সবাজার

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সিবিএ-ইসিএ প্রকল্পের মাধ্যমে Ecosystem specific biodiversity conservation and climate change risk reduction action plans প্রণয়ন করা হয়েছে। গ্রাম সংরক্ষণ দলের অংশগ্রহণে ৩৬১ হেক্টর কক্সবাজার উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বন সৃজন ও সংরক্ষণ, হাকালুকি হাওড়ে ১৭.২৯ হেক্টর জলাভূমি বন সৃজন ও সংরক্ষণ এবং ৬২ হেক্টর বালিয়াড়ি বনায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও ৬৮৫ হেক্টর জলাভূমি ও ৫০০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বন কে সংরক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রাম সংরক্ষণ দলের অংশগ্রহণে হাকালুকি হাওড়ের ১০টি বিল কে পুন:খনন করে জলাভূমি অভয়াশ্রম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। হাকালুকি হাওড়ে ৮৬৪ হেক্টর এলাকা বন্যপ্রাণীর জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। ০৫টি সামুদ্রিক কাছিম প্রজননকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ২,১৫,৭৭৩টি কাঠের, ফলের ও ভেষজ উদ্ভিদের চারা স্থানীয় জনগণের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

চিত্র: সৌর শক্তিৎচালিত লবণমুক্ত সুপেয় পানি সরবরাহ প্লান্ট, নুনিয়ারছড়া, কক্সবাজার। প্লান্ট উদ্বোধন করছেন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ ও পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ রইছউল আলম মণ্ডল

জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ সংরক্ষণের জন্য ৬৩ টি কমিউনিটি গার্ড নিয়োগ করা হয়েছে। এগুলোর যথাযথ সংরক্ষণের জন্য ইতোমধ্যে ১৭ জনকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্প এলাকায় পাঁচটি সৌরচালিত ইরিগেশন প্ল্যান্ট এবং দুইটি সৌরচালিত লবণমুক্ত সুপেয় পানি সরবরাহ প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। প্রবল ঢেউয়ের আঘাত থেকে হাওর এলাকার বসতবাড়ি ও সম্পদ রক্ষার জন্য হাকালুকি হাওরে ১০টি সাবমার্জিবল বাঁধ নির্মাণ ও বাঁধ বরাবর সবুজবেষ্টনী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয়মূলক কার্যক্রমের জন্য হাকালুকি হাওর এবং কক্সবাজারের ৬৮টি গ্রাম সংরক্ষণ দলকে ৬৮ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র মূলধন অনুদান (Micro Capital Grant, MCG) প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নিয়োজিত গ্রাম সংরক্ষণ দলের দপ্তর হিসেবে, দলের কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার সুবিধার্থে এবং পরিবেশ-প্রতিবেশ-জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রমসহ এলাকার সমামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের লক্ষ্যে হাকালুকি হাওরে ৬টি এবং কক্সবাজারে কক্সবাজারে ৪টি মোট ১০টি প্রতিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। কেন্দ্রে সপ্তাহে একটি দিন নির্ধারিত থাকবে এলাকার নারীদের জন্য যেদিন কেবলমাত্র নারীরাই তাদের প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনার জন্য কেন্দ্রটি ব্যবহার করবেন। প্রতিটি প্রতিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্রে একটি জীববৈচিত্র্য মিউজিয়ামও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

চিত্র: কক্সবাজারে গ্রাম সংরক্ষণ দলের সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্র মূলধন অনুদানের চেক হস্তান্তর

চিত্র: প্রতিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্রে জীববৈচিত্র্য মিউজিয়াম

জীববৈচিত্র্য বিষয়ক আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন

বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১৬-এর খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে। আইনের খসড়াটি সংসদে বিল আকারে উত্থাপনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বিধিমালা ২০১৬ এর খসড়া ভেটিংয়ের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে বিবেচনাধীন রয়েছে।

মরুময়তা রোধে জাতীয় কর্মকৌশল প্রণয়ন

তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট খরা বাংলাদেশের জন্য একটি বিরাট সমস্যা। এতে ফসল উৎপাদন, পশু পালন ও মৎস্য চাষ ব্যাহত হয় এবং জীববৈচিত্র্যের পরিবর্তন হয় যা ভূমির অবক্ষয় ও সামগ্রিকভাবে কৃষি ও পরিবেশকে মারাত্মকভাবে সংকটে ফেলে। অনুমান করা হয় বিশ্বে ২৫০ মিলিয়ন মানুষ সরাসরি ভুমির অবক্ষয়জনিত ক্ষতির শিকার এবং ১ বিলিয়নের অধিক মানুষ ভুমির অবক্ষয়জনিত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এমনই ভয়াবহ অবস্থার প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপি পরিবেশের অবক্ষয় রোধ ও পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো তে অনুষ্ঠিত ধরিত্রি সম্মেলনে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রধান তিনটি

Convention গৃহিত হয়। কনভেনশন গুলো হলো: (১) UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), (২) UN Convention on Biodiversity(UNCBD) and (৩) UN Convention to Combat Desertification (UNCCD) বাংলাদেশ UNCCD স্বাক্ষর ও অনুসাক্ষর করে যথাক্রমে ১৯৯৪ ও ১৯৯৬ সালে। UNCCD এর আওতায় অবশ্য করনীয় কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে- (১) মরুময়তা, খরা ও ভূমির অবক্ষয় রোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন (National Action Program NAP) করা (২) খরা ও ভুমির অবক্ষয় রোধে বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত/বাস্তবায়িত কার্যক্রমের উপর দ্বি-বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে UNCCD সচিবালয়ে দাখিল করা। UNCCD এর আওতায় বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনের জন্য GEF এর আর্থিক সহায়তায়র্তৃক Bangladesh : Revision and Alignment of National Action Program (NAP) with UNCCD 10- year Strategic Plan and Frame work শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের আওতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে নিম্নরূপ কার্যাদি সম্পাদিত হয়।

১. UNCCD 6th National Report প্রনয়ন করে UNCCD সচিবালয়ে দাখিল করা হয়েছে।
২. ভূমির অবক্ষয় মোকাবেলায় Bangladesh National Action Program to combat Desertification, Land Degradation and Drought 2015-2024 প্রনয়ন করা হয়েছে।
৩. Bangladesh: Combating Land Degradation and Drought series-1&2 প্রকাশ করা হয়েছে।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত অংশীদারিত্বমূলক কর্মসূচি

জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রম

প্রারম্ভিক পরামর্শ সভা

কর্মসূচি শুরুর প্রাক্কালে একটি প্রারম্ভিক পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। এলজিইডি এর সভাকক্ষে ১৬ ফেব্রুয়ারি সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে অতিরিক্ত জনাব আব্দুল্লাহ আল মহসিন চৌধুরী সচিব উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ রইছউল আলম মন্ডল। শব্দদূষণের ক্ষতি এবং প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. প্রাণ গোপাল দত্ত। কর্মসূচির উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম সম্পর্কে উপস্থাপন করেন কর্মসূচি পরিচালক ফরিদ আহমেদ। সভায় সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার সংশ্লিষ্টগণ উপস্থিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন। সভার সংবাদ ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট এবং অনলাইনে প্রচারিত হয়।

শব্দ সচেতনতামূলক টেলিভিশন অনুষ্ঠান

কর্মসূচির আওতায় এপ্রিল, ২০১৬ তারিখ হতে ধারাবাহিকভাবে প্রতি মঙ্গলবার চ্যানেল আই-এ ২৫ মিনিটের শব্দ সচেতনতা অনুষ্ঠান নিয়মিত প্রচারিত হচ্ছে। অনুষ্ঠানে শব্দদূষণের নেতিবাচক প্রভাব বিশেষ করে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের ক্ষতি সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানোর জন্য আলোচনার জন্য বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত থাকছেন। সেই সঙ্গে শব্দদূষণের কারণ এবং প্রতিকার বিষয়েও সংশ্লিষ্টজনেরা অংশগ্রহণ করছেন। অনুষ্ঠানে আলোচনার পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত প্রামান্য চিত্র, কুইজ, গান ইত্যাদি রাখা হচ্ছে।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে টিভিসি নির্মাণ ও প্রচার

কর্মসূচির অধীনে টার্গেট গ্রুপ অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক ৫টি টিভিসি নির্মিত হয়েছে। টার্গেট গ্রুপ এবং বিষয়গুলি হচ্ছে ১) গাড়ি মালিক এবং গাড়ির হর্ন; ২) গাড়িচালক এবং গাড়ির হর্ন; ৩) সর্বসাধারণ এবং শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে করনীয়; ৪) এম্বুলেন্স চালক এবং সাইরেন; এবং ৫) সর্বসাধারণ এবং কর্মসূচি কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগসমূহ। বিটিভিসহ বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে এগুলো প্রচারিত হচ্ছে। এছাড়া প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রশিক্ষণার্থীদের সচেতন করার জন্য দেখানো হয়ে থাকে।

আন্তর্জাতিক শব্দ সচেতনতা দিবস উদযাপন

চিত্র: আন্তর্জাতিক শব্দ সচেতনতা দিবস, ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত র‍্যালীর শুভ উদ্বোধন করছেন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব ও মাননীয় সচিব জনাব ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ রইছউল আলম মন্ডল।

কর্মসূচির উদ্যোগে আন্তর্জাতিক শব্দ সচেতনতা দিবস উদযাপিত হয়েছে। গত ২৭ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে আর্ন্তজাতিক শব্দ সচেতনতা দিবস উপলক্ষে জাতীয় সংসদ ভবনের সন্মুখস্থ ন্যাম ভবনের সামনে স্কুলের শিক্ষার্থী, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির অংশগ্রহণে অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক কর্মসূচির আওতায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী ও সন্মানিত সচিবের উপস্থিতিতে শব্দ সচেতনতা সমাবেশ এবং শোভাযাত্রা আয়োজন করা হয়।

দিবসটি উপলক্ষে চ্যানেল আই-তে গানে গানে সকাল শুরু অনুষ্ঠানটি বিশেষভাবে সম্প্রচার করা হয়। একই দিন বিকেল বেলায় চ্যানেল আই-তে শব্দ সচেতনতায় বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সচেতনতামূলক উপকরণ

কর্মসূচি এর আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপকরণ তৈরির পরিকল্পনা ছিল। সে অনুযায়ী ফোল্ডার, নোট প্যাড, লিফলেট ও স্টিকার মুদ্রণ করা হয়েছে। লিফলেটে শব্দদূষণ এর ক্ষতি এবং এ থেকে উত্তরণের জন্য সর্বসাধারণের করণীয় সম্পর্কে বার্তা প্রদান করা হয়। স্টিকারগুলিতে গাড়ির হর্ন বাজানো থেকে বিরত থাকার জন্য শ্লোগানের মাধ্যমে আহ্বান জানানো হয়।

টেলিভিশনে বিভিন্ন কার্যক্রমের সংবাদ প্রচার

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সংবাদ টেলিভিশন চ্যানেলসমূহ গুরুত্ব সহকারে প্রচার করেছে। পত্র-পত্রিকায়ও কার্যক্রমের সংবাদ এবং শব্দদূষণ বিষয়ে বিশেষ প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে।

অনলাইন পোর্টাল ও সামাজিক মাধ্যমে প্রচার

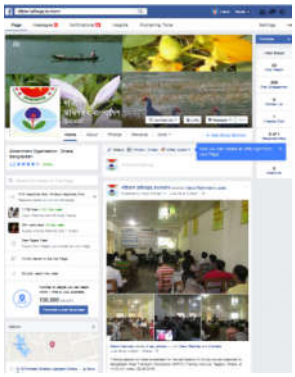

বর্তমানে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সামাজিক মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া অনলাইন পোর্টাল বিভিন্ন বিষয়ে সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। এজন্য শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি এর অধীনে বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রচারে অনলাইন পোর্টাল এবং সামাজিক মাধ্যমের সাহায্য নেয়া হয়েছে। যা সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম

কর্মসূচির লক্ষ্য পূরণে ইতিমধ্যে ৮৭০৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারি, পুলিশ, চালক প্রশিক্ষক, গাড়ি চালক এবং স্কুলের শিক্ষার্থীরা রয়েছেন। প্রশিক্ষণে শব্দদূষণের নেতিবাচক প্রভাব এবং উত্তরণের উপায় সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়। এছাড়া যার যার অবস্থান থেকে কি ধরনের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষক উভয় পক্ষের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে। যা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের তাগিদ তৈরি করেছে।

জরিপ কার্যক্রম

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত অংশীদারিত্বমূলক কর্মসূচির আওতায় ও পরিবেশ অধিদপ্তর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ওয়ার্ক ফর বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট ঢাকা শহরের শব্দের মাত্রা পরিমাপে একটি জরিপ পরিচালনা করে। রাজধানীর ৭০ টি পয়েন্টে এ জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। জরিপের খসড়া প্রতিবেদনে দেখা গেছে , দিন, সন্ধ্যা ও রাতব্যাপী গড় শব্দের মাত্রা সহনীয় পর্যায়ের অনেক উপরে। নীরব এলাকার জন্য শব্দের মানমাত্রা নির্ধারিত থাকলেও বহুগুণ বেশী মাত্রার শব্দ রেকর্ড করা হয়েছে।

শব্দদূষণের জন্য যানবাহনের হর্ন, নির্মাণ কাজ ও কল-কারখানা সৃষ্ট শব্দকে দায়ী করেছেন জরিপে অংশগ্রহনকারীরা। জরিপের তথ্যমতে, শব্দদূষণ কারণের মধ্যে হাইড্রোলিক হর্ন, ইটভাঙ্গার মেশিন, জেনারেটর, টাইল ও ইটভাঙ্গার মেশিন এবং ড্রিলমেশিন সৃষ্ট শব্দ রয়েছে প্রথম দিকে। জরিপে অংশনেওয়া ৮০ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, শব্দদূষণের জন্য যানবাহন দায়ী। জরিপে শব্দদূষণ রোধে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ নেই বলে তথ্য উঠে এসেছে। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৯৬ শতাংশ উত্তরদাতা শব্দদূষণ প্রতিরোধে আইনের প্রয়োগ কখনো দেখেননি বলে জানিয়েছেন। এই জরিপ কার্যক্রম শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক ভুমিকা রাখবে। উল্লেখ্য দেশের বাকী সাতটি বিভাগীয় শহরে এই জরিপ কার্যক্রমটি পরিচালিত হবে।

সাউন্ড লেভেল মিটার সংগ্রহ ও বিতরণ

কর্মসূচির আওতায় ২০০ সাউন্ড লেভেল মিটার ক্রয় করা হয়েছে। যা বিআরটিএ, ট্রাফিক পুলিশ ও পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যালয়ে সরবরাহ করা হবে। শব্দের মাত্রা পরিমাপ সাপেক্ষে সংস্থাগুলি কর্তৃক পদক্ষেপ গ্রহণে মিটারগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এনফোর্সমেন্ট ও রাজস্ব কার্যক্রম

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ (এনফোর্সমেন্ট) কার্যক্রম

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫(সংশোধিত ২০১০) এর ৭ ধারা মোতাবেক কোন ব্যাক্তির কর্মকান্ড দ্বারা পরিবেশের ক্ষতি সাধিত হলে উক্ত ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে তা আদায়ের বিধান রয়েছে। ইহা Polluters Pay Principle নামে বহুল পরিচিত। পরিবেশ সংরক্ষণে এটি একটি উত্তম কৌশল। উন্নত বিশ্বে এ পদ্ধতি অধিক মাত্রায় বিরাজমান। পরিবেশ ও প্রতিবেশ বিনষ্ট এবং ব্যাপক মাত্রার পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে ২০১০ সালের ১৩ জুলাই হতে পরিবেশ অধিদপ্তর দূষণকারীদের বিরুদ্ধে আইনের উক্ত ধারার আওতায় এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম শুরু করে। সারা দেশে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে একটি স্বতন্ত্র এনফোর্সমেন্ট শাখা রয়েছে। এর পাশাপাশি চট্রগ্রাম মহানগর ও চট্টগ্রাম অঞ্চল কার্যালয়ের পরিচালকগণ তাদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। এনফোর্সমেন্ট অভিযানের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রকৃত পরিবেশ দূষণকারীদের চিহ্নিতকরণ, মাঠ পর্যায়ে পরিবেশের ক্ষতির মাত্রা নির্ধারণ, পরিবেশ দূষণকারীদের আইনের আওতায় এনে ক্ষতিপূরণ আদায় এবং পরিবেশ আইন প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ। নির্বিচারে নদ-নদী ও খাল-বিল দূষণ, জলাশয় ভরাট, অপরিকল্পিত আবাসন ও বহুতল ভবন নির্মাণ, কৃষি জমি ধ্বংস করে ইটভাটা তৈরি, নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ উৎপাদন, মজুদ, বিপনণ ও পরিবহণ, শব্দদূষণের মাধ্যমে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি ইত্যাদি প্রধান প্রধান পরিবেশ অপরাধ দমনে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এনফোর্সমেন্ট অভিযানের মূল বৈশিষ্ট্য সমূহ নিম্নরূপঃ

১. আকস্মিক অভিযানের মাধ্যমে দূষণের ঘটনা হাতেনাতে উদ্‌ঘাটন;
২. ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণ থেকে সরাসরি পরিবেশ দূষণের অভিযোগ গ্রহণ;
৩. সংবাদপত্রে প্রকাশিত দূষণের ঘটনার সংবাদের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনা;
৪. সরেজমিনে পরিবেশ দূষণের ঘটনা অবলোকন ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ;
৫. ইটিপি/এটিপি পরিচালনা পর্যবেক্ষণ;
৬. বর্জ্য নির্গমন স্থলে সরাসরি গমন ও বর্জ্যের মান বিশ্লেষণ;
৭. তাৎক্ষণিক ক্ষতিপূরণ দণ্ড আরোপ ও আদায়;
৮. কারিগরি/প্রযুক্তিগত পরামর্শ ও নৈতিক দিক নির্দেশনা প্রদান;
৯. মাঠ পর্যায়ে দূষণের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা তৈরি।

২০১৫-২০১৬ সময়ে পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের এনফোর্সমেন্ট অভিযানের তথ্য চিত্র

এক নজরে মোট তথ্য ঃ

অভিযানের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান/স্থাপনা/ব্যক্তির মোট সংখ্যা	**:**	**৪৮৪ টি**
ক্ষতিপূরণ ধার্য	**:**	**২৮.৪০ কোটি টাকা**
ক্ষতিপূরণ আদায়	**:**	**১১.৪৯ কোটি টাকা**

প্রতিষ্ঠানভিত্তিক এনফোর্সমেন্ট অভিযান

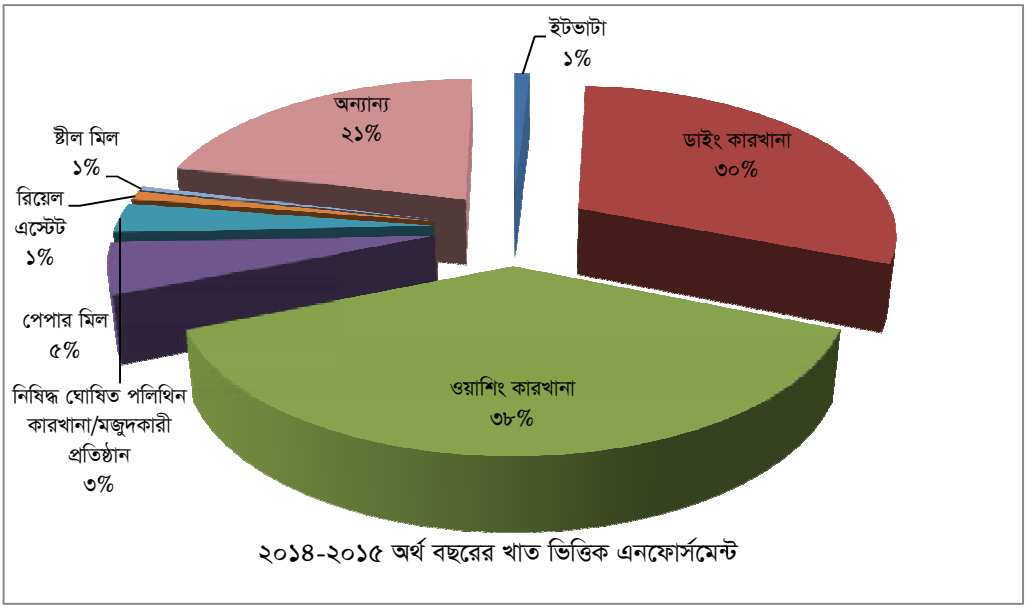

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের খাত ভিত্তিক এনফোর্সমেন্ট

দূষণের প্রকৃতি ভিত্তিক ২০১৫ - ২০১৬ অর্থ বছরে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি

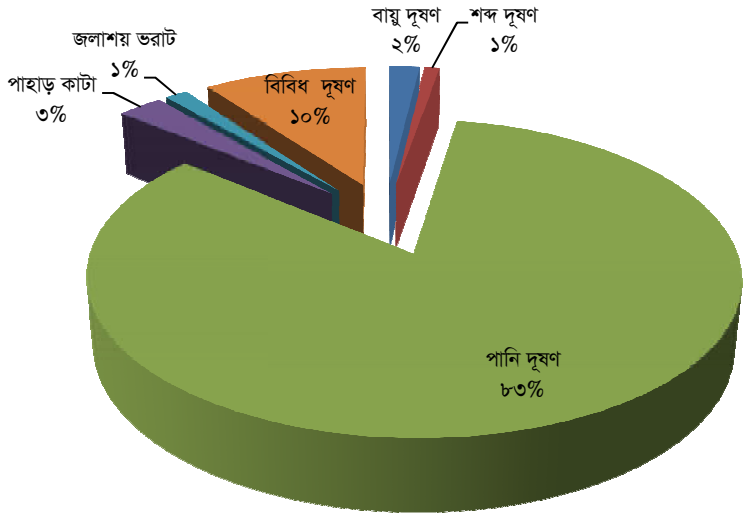

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের দূষণের প্রকৃতি ভিত্তিক এনফোর্সমেন্ট

চিত্র: পরিবেশ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট টিম কর্তৃক তরল বর্জ্য নির্গমনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) পরিদর্শন।

পরিবেশ বিষয়ক মামলা ও রীট

পরিবেশ সংক্রান্ত অপরাধের বিচার করার জন্য সরকার পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০ জারিপূর্বক দেশে পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট-এ ৩ (তিন)টি পরিবেশ আদালত এবং ১৯টি জেলায় পরিবেশ বিষয়ক স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের কার্যক্রম চালু রয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর হতে দেশের আরো ২৫টি জেলায় পরিবেশ আদালত এবং ০৭টি বিভাগীয় শহরে পরিবেশ আপীল আদালত প্রতিষ্ঠার একটি প্রস্তাব পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) মোতাবেক দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, প্রকল্প বা ব্যাক্তির বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনার পাশাপাশি নিয়মিত পরিবেশ আদালত বা স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মামলা করে থাকে। পরিবেশ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ কর্তৃক ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে শিল্প বর্জ্যের দ্বারা পরিবেশ দূষণ, পাহাড় কর্তণ ও জলাধার ভরাট করার মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতি করায় পরিবেশ আদালত ও স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সর্বমোট ৬৮ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

অপর দিকে পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম ও সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান পরিবেশ অধিদপ্তর বা সরকারের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে রীট পিটিশন করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে মহামান্য আদালত কিছু কার্যক্রম গ্রহণে পরিবেশ অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। এ ধরনের কার্যক্রমের গত ৫ বছরের তথ্যচিত্র নিম্নে প্রদান করা হলো :

ছক: পরিবেশ অধিদপ্তর/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রীট পিটিশনের পরিসংখ্যান

বছর	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	কনটেম্পন্ট মামলা
২০০৯ পর্যন্ত	২৩৫	-
২০১০	১২৩	২
২০১১	৯৬	৩
২০১২	৩৫	১
২০১৩	৭৯	-
২০১৪	১৩৯	২
২০১৫	৮৫	-
২০১৬ (জুন পর্যন্ত)	৬৫	১

রাজস্ব কার্যক্রম

পরিবেশ অধিদপ্তর দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মানোন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনকল্পে কাজ করে থাকে। পরিবেশ অধিদপ্তর সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিমূলক প্রতিষ্ঠান নয়। তথাপিও পরিবেশ অধিদপ্তর শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়নকরণ এবং গবেষণাগারে বিভিন্ন নমুনা বিশ্লেষণ বাবদ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ মোতাবেক নির্ধারিত ফি আদায় এবং এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের আওতায় দূষণকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। নিম্নের সারনীতে পরিবেশ অধিদপ্তরের রাজস্ব আয় ও রাজস্ব ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণী প্রদান করা হলো:

অর্থ বছর	রাজস্ব আয় (কোটি টাকায়)	রাজস্ব ব্যয় (কোটি টাকায়)	**নীট ব্যালেন্স**
২০০২-২০০৩ হতে ২০১১-২০১২	১০৪.৬০	৭৪.৯২	**২৯.৬৮**
২০১২-২০১৩	৭০.৮৪	২২.০২	**৪৮.৮২**
২০১৩-২০১৪	৫৯.৪৭	২০.৮৪	**৩৮.৬৩**
২০১৪-২০১৫	৫৭.১৭	২৩.৩১	**৩৩.৮৬**
২০১৫-২০১৬	৫২.৭০	২৯.৯৮	**২২.৭২**
মোট	**৩৪৪.৭৮**	**১৭১.০৭**	**১৭৩.৭১**

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে পরিবেশ অধিদপ্তরের রাজস্ব আয়ের প্রদান উৎস ছিল পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন ফি বাবদ আদায়কৃত অর্থ। এ খাতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৩৩.৩১ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়। অপরদিকে ক্ষতিপূরণ বাবদ আদায় করা হয় ১৩.৬৫ কোটি টাকা, গবেষণাগারের নমুনা বিশ্লেষণ ফি বাবদ ৪.৮০ কোটি এবং অন্যান্য খাতে আদায় হয় ০.৯৩ কোটি টাকা।

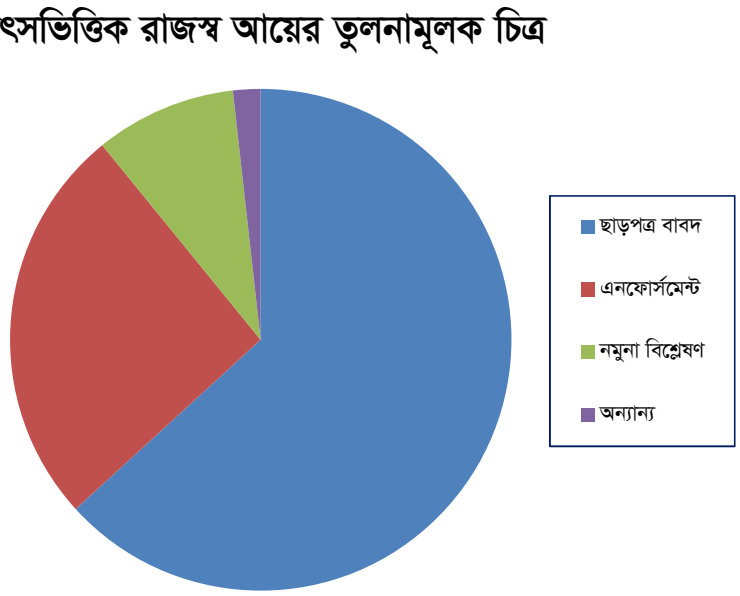

চিত্র: বিভিন্ন খাত হতে অর্জিত রাজস্ব আয়ের তুলনামূলক চিত্র

প্রশিক্ষণ ও তথ্য প্রযুক্তি

মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম

সরকার ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করেছে। সরকারের উন্নয়নের এ মহতি লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে জনশক্তিকে দক্ষ মানব সম্পদ হিসাবে গড়ে তোলার বিকল্প নেই। তাছাড়া একটি প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্যও দক্ষ মানব সম্পদ গড়িয়া তোলা অত্যাবশ্যক। মূলতঃ উন্নত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দক্ষ জনবল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পরিবেশ অধিদপ্তর তার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকার কর্তৃক ঘোষিত বাৎসরিক ১০০ ঘন্টা প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

চিত্রঃ পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত "Application of Automation Software on Environmental Clearance" ও "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অবহিতকরণ" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে Project Preparation and Management, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, GIS and Remote Sensing application for Environmental Monitoring, তথ্য অধিকার আইন, অনলাইনে ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কসপ আয়োজনের পাশাপাশি নবাগত কর্মকর্তাদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্রঃ পরিবেশ অধিদপ্তরের গবেষণাগার কর্মচারী (নমুনা সংগ্রহকারী ও গবেষণাগার সহকারী) ও গাড়ি চালকদের জন্য আয়োজিত যথাক্রমে "নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি" ও "গাড়িচালনার মৌলিক নিয়মাবলী" শীর্ষক প্রশিক্ষণ।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে একাউনটেন্ট, নমুনা সংগ্রহকারী, গাড়ি চালক, অফিস সহকারী, গবেষণাগার সহকারী, অফিস সহায়কসহ সকল পর্যায়ের কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের নিজস্ব উদ্যোগে খাত ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

এছাড়াও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশ-বিদেশের বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থা বা প্রকল্প কর্তৃক পরিবেশ অধিদপ্তরের দাপ্তরিক কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা, ওয়ার্কসপ ও সভা সেমিনারে অংশ গ্রহণের জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারী বেসরকারী দপ্তর থেকে শিক্ষা সফরে আগত প্রতিনিধিদের পরিবেশ অধিদপ্তর এবং সরকারের পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমের উপর ব্রিফ করা হয়েছে।

চিত্রঃ পরিবেশ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে চট্রগ্রামে সংরক্ষিত পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ডিডিটি এর উপর এনালাইটিক্যাল রিপোর্ট

মানব সম্পদ উন্নয়নে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

মানব সম্পদ কর্মসূচীর প্রকৃতি	কর্মসূচির পরিমাণ/সংখ্যা
পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ	১৮৩১৬ জন ঘন্টা
দেশীয় অন্যন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ	৬০০৮ জন ঘন্টা
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ,সেমিনার,কর্মশালা ও কনফারেন্স	৬৯২৮ জন ঘন্টা
মোট কর্মসূচি	৩১২৫২ জন ঘন্টা।
জনপ্রতি গড়	৮৫.৮৬ জন ঘন্টা

পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজেশন করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ বিষয়ক অনলাইন ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ব্যতিত বর্তমান গতিশীল বিশ্বের চাহিদাপূরণ সম্ভব নয়। তাই সকল ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের এ মহতী উদ্যোগ বাস্তবায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর নিজ অধিক্ষেত্রে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Access to Information (a2i) Programme –এর সহযোগিতায় পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে অধিকতর গ্রাহকসেবা মুখী করার লক্ষ্যে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়াকে অটোমেশন করা হয়েছে, যা World Summit on Information Society এর WSIS Prizes 2016 contest এ Champion Project হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে নিম্নরূপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে:

- পরিবেশগত ছাড়পত্র অটোমেশন করা হয়েছে। এতে উদ্যোক্তাগণ অনলাইনে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য দিয়ে আবেদন করতে পারে এবং পাশাপাশি অনলাইনে পরিবেশগত ছাড়পত্র পেতে পারে। এতে অধিদপ্তর দ্রুত সময়ে ছাড়পত্র প্রদান করতে পারছে।
- ওয়েবসাইটে অধিদপ্তরের সকল আইন, বিধি, রিপোর্ট, গেজেট, নাগরিক সেবার তথ্য/উপাত্ত সংরক্ষিত রয়েছে। ওয়েবসাইটের তথ্য সুরক্ষার জন্য নিরাপত্তাও বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তাদের দপ্তরের নিজস্ব ডোমেইনে ইমেইল অ্যাকাউন্ট তৈরী করা হয়েছে। এতে সকল কর্মকর্তা ইমেইল ব্যবহার এর সুযোগ পাচ্ছে।
- অধিদপ্তরের জন্য একটি ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরী করা হয়েছে।
- এনফোর্সমেন্ট, রীট মামলা এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ডাকাবেজ সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে এতে সহজেই রিপোর্ট জেনারেট করা সম্ভব হচ্ছে।
- অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে হাইস্পিড ইন্টারনেট সুবিধা লাভের জন্য ব্যান্ডউইথ উন্নীত করা হয়েছে। পাশাপাশি সকল বিভাগীয় কার্যালয়ে অপটিক্যাল সংযোগসহ পরিপূর্ণ ল্যান সেটআপের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ফলে প্রতিটি কম্পিউটারই রিসোর্স শেয়ারিং এবং হাইস্পিড ইন্টারনেট ব্রাউজিং এর সুবিধা লাভ করেছে।
- তথ্য ভান্ডার হিসেবে অধিদপ্তরের সার্ভারে নতুন সার্ভার (Network Attached Storage) সংযুক্ত করা হয়েছে । এতে ল্যানভুক্ত সকল ইউজার Large Volume Data শেয়ার ও সংরক্ষণ করতে পারছে ।

প্রচার ও প্রকাশনা

পরিবেশ মেলা আয়োজন

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৫ উপলক্ষে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে অধিদপ্তরের বিভাগীয়/জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশ মেলা আয়োজন করা হয়। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও সাত দিনব্যাপী পরিবেশ মেলা উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পরিবেশ সংরক্ষণ, টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা এবং পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণে উদ্যোক্তাগণক উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর প্রতিবছর পরিবেশ মেলার আয়োজন করে। দেশি বিদেশী ৬৮টি প্রতিষ্ঠান ২০১৫ সালের পরিবেশ মেলায় নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ বান্ধব পন্য ও প্রযুক্তির প্রদর্শন করে।

চিত্র: পরিবেশ মেলা ২০১৫ শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা

পরিবেশ পদক প্রদান

উন্নত পরিবেশ সুস্থ জীবনে পূর্বশর্ত। আধুনিকায়ন, নগরায়ন, শিল্পায়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। একইসাথে এসবের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বাংলাদেশের সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত এবং পরিবেশ সংরক্ষণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানে সরকার বদ্ধপরিকর। পরিবেশের ক্ষেত্রসমূহ ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হওয়ায় সরকারের পক্ষে এককভাবে পরিবেশ রক্ষায় যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত দূরহ। দেশের প্রতিটি নাগরিককে তাঁর অবস্থান থেকে পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। এ প্রেক্ষাপটে, সরকার পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে জাতীয় পরিবেশ পদক প্রবর্তন করে। শুরুতে চারটি ক্যাটাগরি যথা: (ক) পরিবেশ সংরক্ষণ, (খ) পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, (গ) পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং (ঘ) পরিবেশগত শিক্ষা ও প্রচার- এ জাতীয় পরিবেশ পদক প্রদান এবং জাতীয় পরিবেশ পদকের সম্মানী ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকায় উন্নীত করে জাতীয় পরিবেশ পদক নীতিমালা সংশোধিত হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ব্যক্তিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অনন্য অবদান রেখে চলেছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২৪ মে ২০১২ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিবেশ পদক কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুসরণে পরিবেশ উন্নয়নে ব্যক্তি সাধারণের অবদানকে স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় পরিবেশ পদক প্রদান করা হয়। ২০১৫ সালে পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ (ব্যক্তিগত),

চিত্র: বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৫-এ পরিবেশ পদক বিতরণ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা

এডভোকেট মনজিল মোরসেদ, প্রেসিডেন্ট, হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ এবং পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা ও প্রচার (ব্যক্তিগত), আব্দুল মুকিত মজুমদার (বাবু), আতিয়া রিজেন্সী নামক প্রতিষ্ঠান দুটি জাতীয় পরিবেশ পদক প্রাপ্ত হন।

সমাবেশ ও শোভাযাত্রা আয়োজন

জনসচেতনতা বৃদ্ধি, পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার উন্নয়নে স্থানীয় জনসংগঠন, নাগরিক সমাজ এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে ২৩ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগরস্থ ঢাকা আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য মেলার মাঠে মেলা চলাকালীন সময়ে পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক উদ্বুদ্ধকরণ সমাবেশ ও শোভাযাত্রা আয়োজন করা হয়।

চিত্রঃ পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক উদ্বুদ্ধকরণ র‍্যালি

পরিবেশ বিষয়ে জনসচেতনেতা ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৬ উদযাপন

জাতীয় পর্যায়ে ৫ জুন ২০১৬ তারিখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপিত হয়। এবছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য ঃ **বণ্যপ্রাণী ও পরিবেশ, বাঁচায় প্রকৃতি বাঁচায় দেশ (Go Wild for Life!)**। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তর ও দৈনিক সমকাল পত্রিকার যৌথ উদ্যোগে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় উপমন্ত্রী, সন্মানিত সচিবের উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অংশগ্রহণে **'টেকসই উন্নয়নে পরিবেশ'** শিরোনামে গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্রঃ **'টেকসই উন্নয়নে পরিবেশ'** শিরোনামে গোলটেবিল আলোচনা

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, পরিবেশ বিষয়ক শ্লোগান প্রতিযোগিতা এবং আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন ও বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ, বিভাগীয়/জেলা পর্যায়ে সমাবেশ ও শোভাযাত্রা এবং পরিবেশ মেলা আয়োজন, গাছের চারা বিতরণ, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে খুদে বার্তা প্রেরণ, বুয়েটসহ ২ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনার আয়োজন, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতারে আলোচনা অনুষ্ঠান সম্প্রচার, নির্বাচিত জাতীয় দৈনিকে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশসহ নানা কর্মসূচি পালন করা হয়। এছাড়া, প্রবন্ধ/কবিতাসম্বলিত সমৃদ্ধ সুদৃশ্য স্মরণিকা ও জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৬ এর পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। জাতীয় কর্মসূচির আলোকে সকল জেলা/উপজেলায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

চিত্রঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৬ চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

৪র্থ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বিতর্ক ২০১৬

প্রতি বছরের ধারাবাহিকতায় পরিবেশ অধিদপ্তর এবছরও "৪র্থ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০১৬" আয়োজন করেছে। এ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় দেশের খ্যাতিমান ১৬টি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়,

ঢাকা মেডিকেল কলেজ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়, ইনডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় এবং আহসানুল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অংশগ্রহণ করেছে। এ বিতর্ক প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সবোর্চ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা তৈরি করা। বিতর্ক প্রতিযোগিতাটির ১ম পর্যায়ে প্রথম ও সেমিফাইনাল পর্ব গত ২৯-৩০ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে বুয়েট ডিবেটিং ক্লাবের সহযোগিতায় সেন্ট্রাল অডিটোরিয়াম, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২য় পর্যায়ে বিতর্ক

বাংলাদেশ টেলিভিশনে অনুষ্ঠিত "৪র্থ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০১৬"-চূড়ান্ত পর্বে উপস্থিত মাননীয় সচিব ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ রইছউল আলম মণ্ডল, মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, বির্তক প্রতিযোগিতার মডারেটর অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, বির্তক প্রতিযোগিতার বিচারকবৃন্দ, পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বির্তক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-এর বিতার্কিকগণ।

প্রতিযোগিতার ফাইনাল পর্ব সেমিফাইনাল বিজয়ী দুই দল বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-এর অংশগ্রহণে বিটিভি অডিটোরিয়াম-এ ১ জুন ২০১৬ এ অনুষ্ঠিত হয়েছ যা বিশ্ব পরিবেশ দিবস ০৫ জুন ২০১৬ এ বাংলাদেশ টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয়েছে। এবারের প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দল বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়-এর বিতার্কিক দল।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন

নতুন প্রজন্মের মধ্যে পরিবেশ বিষয়ক সচেতনা সৃষ্টির জন্য দেশের সকল জেলার ২টি করে মাধ্যমিক পর্যায়ের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ ঢাকা মহানগরের মাধ্যমিক পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য ১০৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ অধিদপ্তরের সহযোগিতা ও সম্পৃক্ততায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়েছে। নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, হলিক্রস বালিকা স্কুল ও কলেজ, উইলস লিটলস ফ্লাওয়ার স্কুল ও কলেজ, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ইত্যাদির মত ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রায় সবকটি স্কুলসহ কয়েকটি মাদ্রাসা ও প্রতিবন্ধি স্কুল অন্তর্ভুক্ত ছিল। নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হলো:

চিত্র: পরিবেশ অধিদপ্তরের সহযোগিতা ও সম্পৃক্ততায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০১৬ উদযাপনের জন্য প্রণোদনা প্রদান অনুষ্ঠান

- দিবসটি উদযাপনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর ঢাকা মহানগরীর নির্বাচিত প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা এবং জেলা পর্যায়ের নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে ৪০০০/- (চার হাজার) টাকা করে অনুদান প্রদান করে।
- ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা

চিত্র: পরিবেশ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় ধানমন্ডি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃক বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্রীদের

মহানগরের নির্বাচিত ১০৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন ডকুমেন্টারী সরবরাহ করা হয়েছে।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিবেশ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতা, বৃক্ষরোপন, পরিবেশ মেলা, দেওয়াল পত্রিকা ও পরিবেশ বিষয়ক ডকুমেন্টারী প্রদর্শন ইত্যাদি কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে।

- দিবসটি উপলক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর ও গ্রীণ সেভার্স নামক একটি বেসরকারী পরিবেশবাদী সংগঠনের উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্র ছাত্রীদের সমন্বয়ে পরিবেশ বিষয়ক গ্রীণ ক্লাব গঠন করা হয়েছে। উক্ত ক্লাবের কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের উদ্যোগে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি করে অক্সিজেন ব্যাংক স্থাপন করা হয়েছে।
- বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিশুদের শব্দ দূষণ হতে রক্ষায় পরিবেশ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ঢাকা মহানগরীর শব্দ দূষণ প্রবন এলাকায় অবস্থিত নির্বাচিত কিছু বিদ্যালয়ে শব্দ দূষণ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর আওতায় তথ্য প্রদান

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে তথ্য অধিকার আইন অনুসরণে তথ্য প্রপ্তির লক্ষে ১৭টি আবেদন/অনুরোধ পাওয়া যায়। আইন অনুসরণে প্রাপ্ত আবেদন/অনুরোধের সবগুলোরই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি/গণবিজ্ঞপ্তি

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য এবং গণসচেতনতামূলক ৫৫টি বিজ্ঞপ্তি/গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

তথ্য প্রদান/তথ্য পেতে সহায়তা প্রদান

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে আনুমানিক ২৫০ জন ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক ও সাংবাদিকগণকে পরিবেশ/পরিবেশ অধিদপ্তর বিষয়ক তথ্য প্রদান/তথ্য পেতে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

প্রকাশনাঃ

- বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্মরণিকা ।
- জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৬ পুস্তিকা।
- পরিবেশ অধিদপ্তর তথ্যপত্র ও Facts about DoE ।
- বায়োডাইভারসিটি ন্যাশনাল এ্যাসেস্‌মেন্ট রিপোর্ট ২০১৫
- ন্যাশনাল বায়োডাইভারসিটি স্ট্যাটেজি এন্ড একশনপ্ল্যান ২০১৬
- শব্দ সচেতনতামূলক প্রচারপত্র ও স্টীকার প্রকাশ এবং বিতরণ।
- UNCCD 6th National Report ।
- Bangladesh National Action Program to combat Desertification, Land Degradation and Drought 2015-2024
- Bangladesh: Combating Land Degradation and Drought series-1&2।
- Community Based ECO System Conservation and Adaptation in Ecologically Critical Areas of Bangladesh
  Responding to Nature and Changing Climate.
- সৌর শক্তি চালিত লবণমুক্ত সুপেয় পানি সরবরাহ প্লান্ট পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা।
- জলাভূমির অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা।
- সৌর শক্তি চালিত সেচ পাম্প পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা।
- জলজ বন সৃজন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা।
- প্রতিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা।
- ওয়াচটাওয়ার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা।

- ডুবন্ত বাঁধ ও সবুজ বেষ্টনী রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা।
- ব্যবসায় পরিকল্পনা।

অভিযোগ প্রতিকার ও গণশুনানি

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১ জুন ২০১৪ তারিখের ০৪.০০.০০০০. ৫১২.৫১. ০০১.১৪-১৫৬ সংখ্যক স্মারকের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে পরিবেশ অধিদপ্তরে প্রতিমাসের প্রথম বৃহস্পতিবার জেলা কার্যালয়, দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার বিভাগীয় কার্যালয় ও তৃতীয় বৃহস্পতিবার সদর দপ্তরে পরিবেশ সংশ্লিষ্ট অভিযোগ শুনানি, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে জনসাধারণ এবং সুধি সমাজের পরামর্শ গ্রহণের জন্য গণশুনানি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গণশুনানীর পাশাপাশি কোন ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠান পরিবেশগত যে কোন বিষয়ে সরাসরি লিখিত অভিযোগ প্রদান করলেও পরিবেশ অধিদপ্তর হতে অভিযোগটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে অধিদপ্তরের সদর দপ্তরসহ জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে আয়োজীত গণশুনানীতে প্রাপ্ত ও লিখিতভাবে দাখিলকৃত আবেদনসহ সর্বমোট ১০৯৮ টি অভিযোগ পাওয়া যায়, যার মধ্যে ৬৬৫ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

চিত্র: সদর দপ্তরে আয়োজিত গণশুনানী অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রথম সরকারি সিডিএম প্রকল্প অনুমোদন

বাংলাদেশে বিদ্যমান গৃহস্থালী বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পারিপার্শ্বিক এলাকায় যেমন দুর্গন্ধ ছড়ায় তেমনি গ্রীনহাউজ গ্যাস (মিথেন) নির্গমন হয়। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান এ সকল সমস্যা নিরসণপূর্বক পরিবেশ সম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর বাংলাদেশের শহরগুলোর জৈব আবর্জনা ব্যবহার করে "প্রোগ্রাম্যাটিক সিডিএম" শীর্ষক পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো - গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস; পরিচ্ছন্ন ও বসবাসযোগ্য শহর গড়ে তোলা; Certified Emission Reduction (CER)/ Verified Emission Reduction (VER) বিক্রির মাধ্যমে বৈদেশিক আয় করা; এবং জৈব সার ব্যবহার করে মাটির গুনাগুন বৃদ্ধি করা ইত্যাদি। প্রকল্পের অধীন নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এবং ময়মনসিংহ পৌরসভায় ইতোমধ্যে ২টি কম্পোস্ট প্ল্যান্ট নির্মিত হয়েছে এবং রংপুর সিটি কর্পোরেশন ও কক্সবাজার পৌরসভায় ২টি কম্পোস্ট প্ল্যান্ট নির্মাণাধীন আছে। প্লান্টে শহরের জৈব আবর্জনা এ্যারোবিক পদ্ধতিতে কম্পোস্ট সারে রূপান্তর করা হয়। প্রকল্পটি ২০১৫ সালে প্রোগ্রাম্যাটিক সিডিএম প্রকল্প হিসেবে ইউএনএফসিসিসি কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে।

চিত্র: বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্থায়নে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত কম্পোস্ট প্ল্যান্ট

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় 3R (Reduce, Reuse and Recycle) ধারণার প্রবর্তন

বর্তমানে বর্জ্যকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, সে বিবেচনায় সরকার ২০১০ সালে National 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Strategy for Waste Management প্রণয়ন করে। National 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Strategy বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে **ঢাকা ও চট্রগ্রাম শহরে বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন (থ্রি আর) পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়ন (ফেজ-১) প্রকল্পের** বাস্তবায়ন কার্যক্রম ২০১০ সালে শুরু করে। প্রকল্পের অধীন ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের গুলশান, বারিধারা, ধানমন্ডি, মিন্টু রোড ও গণভবন, আজিমপুর সরকারী কলোনী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, ইস্কাটন, বেইলি রোড, সিদ্ধেশ্বরী, মতিঝিল, এলেনবাড়ী এবং চট্টগ্রাম শহরের খুলশী ও নাসিরাবাদ, পাঁচলাইশ, আগ্রাবাদ, হালিশহর, মোহাম্মদ আলী রোডসহ অন্যান্য এলাকায় বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন (থ্রি আর) পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

থ্রি-আর পাইলট প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো ঃ (১) ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর নির্বাচিত এলাকায় বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন (থ্রি আর) সংক্রান্ত শ্রেয় ধারণা ও অনুশীলনের প্রসার; (২) কম্পোস্টিং-এর মাধ্যমে বর্জ্য

পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ ও পুনঃব্যবহার; (৩) প্রকল্প এলাকায় গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস; (৪) বর্জ্যের উৎসে পৃথকীকরণ (Source segregation) এবং পুণঃচক্রায়ণের সুফল সম্পর্কে নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি; (৫)ভূমিভরাট (Landfill) এলাকায় বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস; (৬) সরকারী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ উদ্যোগ গ্রহণ; (৭) ঢাকা শহরের গুলশান, বারিধারা, ধানমন্ডি, মিন্টু রোড ও গণভবন, আজিমপুর সরকারী কলোনী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, ইস্কাটন, বেইলি রোড, সিদ্ধেশ্বরী, মতিঝিল, এলেনবাড়ী এবং চট্টগ্রাম শহরের খুলশী ও নাসিরাবাদ, পাঁচলাইশ, আগ্রাবাদ, হালিশহর, মোহাম্মদ আলী রোডসহ এ দুই মহানগরীর অন্যান্য এলাকায় থ্রি-আর (বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ণ) উদ্যোগ বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণ এবং পাইলট, প্রদর্শনী ও রোড-শো'র মাধ্যমে এ উদ্যোগ দেশব্যাপী বিস্তৃতকরণ; (৮) শহরে বসবাসকারী অবহেলিত গরীবদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা; (৯) প্রশিক্ষণ ও আনুষঙ্গিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুনঃচক্রায়ণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি; (১০) কম্পোষ্টিং বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন; (১১) আগ্রহী উৎপাদনকারী, ভোক্তা এবং পুনঃচক্রায়ণকারী কারখানাসমূহকে থ্রি-আর নীতিমালা, কর্ম-কৌশল ও উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা; (১২) ভূমিভরাট (Landfill) থেকে গ্রীন হাউজ গ্যাসের নিঃসরণ হ্রাস; (১৩)"শূন্য বর্জ্য অর্থনীতি"-তে উত্তরণের পথসন্ধান।

প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হলো: (১) ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কম্পোস্ট প্লান্টের জন্য জায়গা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে; (২) দু'টি সিটি কর্পোরেশন-এর জন্য সংস্থানকৃত ২টি করে ৪টি ট্রান্সফার স্টেশনের জায়গা বরাদ্দের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে; (৩) থ্রি-আর প্রকল্পের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে ওয়েস্ট কনসার্ন-কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে Letter of Invitation প্রেরণ করা হয়েছে; (৪) সংশোধিত প্রকল্পে ৬২৪টি রিক্সা-ভ্যান ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে। ইতোমধ্যে নারায়ণগঞ্জ ডক ইয়ার্ড ও খুলনা ডক ইয়ার্ড হতে রিক্সা–ভ্যানের নকশা সংগ্রহ করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই পরার্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনাপূর্বক প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগের ব্যবহার বন্ধে কার্যক্রম

সহজলভ্য এবং অপেক্ষাকৃত কম দামের কারণে সমগ্র বিশ্বে পলিথিন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখণ করে নিয়েছে। কিন্তু অপরিকল্পিত ব্যবহার ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতার কারণে ইহা বর্তমানে পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকির কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। পলিথিনের সহজলভ্যতার কারণে ও সচেতনতার অভাবে মানুষ নৈমিত্তিক কেনাকাটায় হরহামেশা পলিথিন শপিংব্যাগ ব্যবহার করছে এবং একবার মাত্র ব্যবহারের পর যত্রতত্র ফেলে দিচ্ছে। ফলে জলাশয়, কৃষিজমি, পয়ঃনিষ্কাশন ড্রেন ইত্যাদি স্থানে দিন দিন পলিথিনের উপস্থিতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কিন্তু এ সকল পলিথিন অপচনশীল পদার্থ বলে দীর্ঘ দিন প্রকৃতিতে অবিকৃত অবস্থায় থেকে যায়। ফলে জীব বৈচিত্র্যের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ইহা মাটিতে সূর্যালোক, পানি এবং অন্যান্য উপাদান প্রবেশে বাধার সৃষ্টি করে মাটির উর্বরা শক্তি কমিয়ে দেয় এবং পলিথিন উপকারী ব্যাকটেরিয়ার বিস্তারে বাধার সৃষ্টি করে। ইহা শহরের নর্দমাসমূহ বন্ধ করে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে বিপর্যস্থ করে। পলিথিন দ্বারা ভরাটকৃত জমির উপর ভবন নির্মিত হলে তা ধ্বসে পড়ার সম্ভাবনা থাকেসর্বোপরি পলিথিন ব্যাগে সংরক্ষিত খাবার খেলে চর্মরোগ ও ক্যান্সারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া পলিথিনকে ৭০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এর কম তাপমাত্রায় পোড়ালে বিষাক্ত গ্যাস (ডাইঅক্সিন) সৃষ্টি হয়।

পলিথিনের ক্ষতিকর দিক বিবেচনায় সরকার দেশে নির্দিষ্ট পুরুত্বের পলিথিন শপিং ব্যাগের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। তবে কিছু কিছু পন্যের বাজারজাতের জন্য সাধারণতঃ রপ্তানিকৃত সকল পন্যের মোড়কের ক্ষেত্রে, রেনু পোনা পরিবহনের জন্য, পণ্যের গুণগতমান রক্ষার স্বার্থে প্যাকেজিং কাজে ব্যবহারের জন্য, মাশরুম চাষ ও প্যাকেজিং এর জন্য এবং নার্সারীর চারা উৎপাদন ও বিপণনের জন্য কিছু কিছু ছাড় দেওয়া রয়েছে। পরিবেশ বিনষ্টকারী পলিথিনের উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম বন্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছে। তবে কিছু কিছু পন্যের মোড়কের জন্য পলিথিন উৎপাদনের অনুমোদন

থাকায় উক্ত কারখানাগুলো গোপনে নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগও তৈরী করে থাকে। তাছাড়া পলিথিনের সহজলভ্য বিকল্প তৈরী না হওয়ায় এর উৎপাদন ও বিপণন পুরোপুরি বন্ধ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। তা সত্ত্বেও পরিবেশ অধিদপ্তর নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন ও বিপণনের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

পলিথিন মুক্ত বাজার ঘোষণা

নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগের ব্যবহার মূলত কাঁচাবাজার, মাছ বাজার ও মুদির দোকানসমূহে বেশী লক্ষ্য করা যায়। তাই পরিবেশ অধিদপ্তর মনে করে দেশের সকল বাজার সমিতিসমূহকে পরিবেশ অধিদপ্তরের এ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা গেলে

চিত্র: মমতা বহুমুখী সমবায় সমিতি বাজার, আগারগাঁওকে নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন ব্যাগ মুক্ত বাজার ঘোষণা

পলিথিন শপিং ব্যাগের ব্যবহার বন্ধ কায়ক্রম সফল ভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। পরিবেশ অধিদপ্তর এ কার্যক্রমের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বাজার দোকান মালিক সমিতির সহায়তায় ২০১৫ সালে সকল বিভাগীয় শহরে একাধিক বাজারকে পলিথিন মুক্ত বাজার হিসেবে ঘোষণা করে। বাজারের দোকান মালিক সমিতির সদস্যরা সপ্রোনোদিত হয়ে নিজেরাই বাজার মনিটরিং করে। ফলে এ সকল বাজারসমূহকে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে নিয়মিত মনিটর করার প্রয়োজন হয় না।

চিত্র: পরিবেশ অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ বিরোধী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

মোবাাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ বিক্রয় ও সরবরাহের সাথে জড়িত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দ্রুত তাৎক্ষকি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা, বিভাগীয় ও মহানগর কার্যালয়সমূহ জেলা প্রশাসক ও পুলিশ বিভাগের সহায়তায় প্রতিনিয়ত অনুরূপ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে থাকে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনাপূর্বক প্রতি মাসে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ জব্দ করা হয় এবং জরিমানা আদায় করা হয়। পলিথিন শপিং ব্যাগের ব্যবহার বন্ধে ইহা একটি অত্যান্ত কার্যকরী ও ফলপ্রসু কার্যক্রম। কিন্তু জেলা প্রশাসক ও পুলিশ বিভাগ হতে সময় মত ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের সহায়তা পাওয়া না গেলে এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয় না।

নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগের ব্যবহার বন্ধে ট্রস্কফোর্স গঠন

নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিনের উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম বন্ধে পরিবেশ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট শাখাসহ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ কর্তৃক নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমকে আরো জোরদার ও বেগবান করার লক্ষ্যে ২০১৫ সালে র‍্যাব, পুলিশ, সিটিকর্পোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে সারাদেশে ৮টি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়। এসকল মোবাইল কোর্ট ও টাস্কফোর্সের মাধ্যমে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সর্বমোট ৬৫৮টি অভিযান পরিচালনা করে প্রায় ২৩৮ টন পলিথিন জব্দ এবং ২.৬২ কোটি টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

চিত্র: নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ ব্যবহার বন্ধে টাস্কফোর্স টিম কর্তৃক ঢাকার একটি বাজার হতে পলিথিন জব্দ করা হয়

পলিথিনের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানের পরিসংখ্যান

ছক: পলিথিনের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানের পরিসংখ্যান

অর্থ বছর	২০১৪-২০১৫		২০১৫-২০১৬		সর্বমোট
অভিযানের ধরণ	মোবাইল কোর্ট	টাস্কফোর্স	মোবাইল কোর্ট	টাস্কফোর্স	মোবাইল কোট + টাস্কফোর্স
অভিযান সংখ্যা	৪১৫	৫২	৫৫৬	১০২	**১১২৫**
অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১৩৫৯	২৫৬	১৬৪০	৬৪২	**৩৮৯৭**
জব্দকৃত পলিথিনের পরিমান (টন)	১২১.০৬	১২.৩৮	১৬৬.৯	৭১.৪	**৩৭১.৮৪**
আদায়কৃত জরিমানা (টাকা)	১৪০৭৮১০৬/-	৩১২৪৭০০/-	১৮৫১৫০০০/-	৭৭৬২৩০০/-	**৪৩৪৮০১০৬/-**

স্লাজ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধন ২০১০) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ অনুসারে শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে তরল বর্জ্য সৃষ্টিকারী কারখানায় ETP স্থাপন বাধ্যতামূলক। ETP-তে তরল বর্জ্য পরিশোধনকালে ঝুঁকিপূর্ণ অত্যন্ত ক্ষতিকর স্লাজ তৈরী হয়। পয়:বর্জ্য পরিশোধনাগার (STP) থেকেও ঝুঁকিপূর্ণ স্লাজ তৈরী হয়। ETP/STP থেকে সৃষ্ট স্লাজ ব্যবস্থাপনার জন্য কোন গাইডলাইন না থাকায় উক্ত স্লাজ পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করেছে। উক্ত স্লাজ ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর, GIZ এর কারিগরী ও আর্থিক সহায়তায় Bangladesh Standards and Guidelines for Sludge Management, 2015 প্রস্তুত করে এবং উহার ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য গাইডলাইনটি সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে ইতোমধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

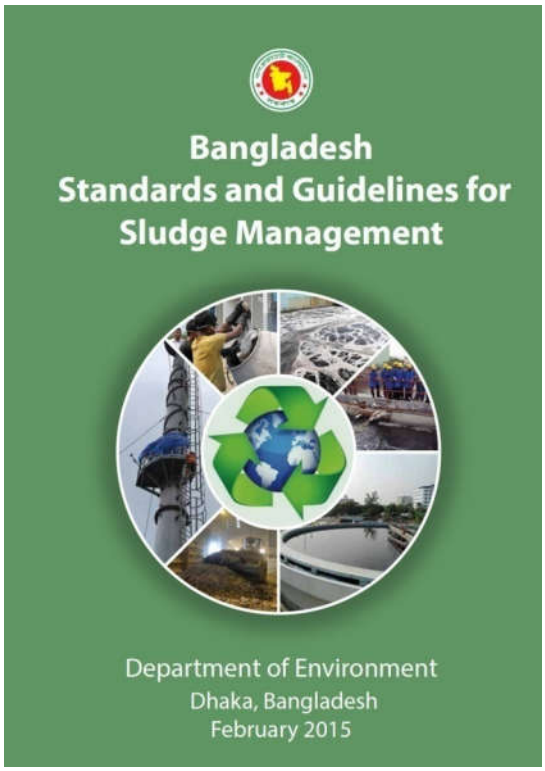

বাংলাদেশে স্লাজ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা তৈরির প্রধান উদ্দেশ্য হলো স্লাজ ব্যবস্থাপনার নেতিবাচক প্রভাব থেকে মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশকে যথাযথভাবে রক্ষা করা। বর্জ্য-ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো 3R (Reduce, Reuse and Recycle) অর্থাৎ হ্রাসকরণ, পুনর্ব্যবহার ও পুর্নচক্রায়ন করা। এছাড়াও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বর্জ্যের প্রবাহকে তার উৎসস্থলেই পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করে ফেলা; যা বর্তমানে জার্মানীসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত।